দারসে হাদীস

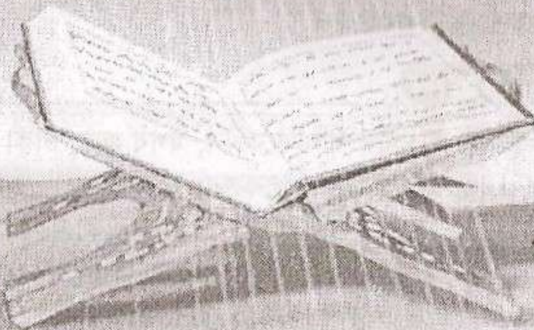
১



অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মতিন

দারসে হাদীস

১



অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মতিন

দারসে হাদীস প্রথম খন্ড
প্রকাশনায় ঃ
সাহাল প্রকাশনী
৩০৮/১, খানজাহান আলী রোড,
তারের পুকুর, খুলনা।

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ ২০০১ সাল
২য় সংস্করণ ঃ ২০০৩ সাল
৬ষ্ঠ মুদ্রণ ঃ আগষ্ট-২০০৮
শাবান-১৪২৯
ভাদ্র-১৪১৫

প্রচ্ছদ ঃ অংকুর, খুলনা।

অক্ষর বিন্যাস ঃ
হাফেজ মাওঃ নাসির উদ্দিন
দেশ কম্পিউটার, খুলনা।
সাহাল কম্পিউটার
৩০৮/১, খানজাহান আলী রোড,
তারের পুকুর, খুলনা।
মোবা ঃ ০১৭১১-৩৮৯০৭৬

মুদ্রণে ঃ
নবযুগ ছাপাখানা ও প্রকাশনী
২৯৮, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।
মোবা ঃ ০১৯১৫-৬৫৯৫৫৬
ঃ ০১৭১৬-০০৯১৩৮

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৩৫ টাকা

পরিবেশনায় ঃ
সাহাল বুক কর্ণার
৩০৮/১, খানজাহান আলী রোড,
তারের পুকুর, খুলনা।
ফোন ঃ ৮১৩০৭৫, ৭২৩৯৬৭
মোবা ঃ ০১৭১১-৩৮৯০৭৬
ঃ ০১৭১২-১০২৪২৭

প্রাপ্তিস্থান

- কেন্দ্রীয় জামায়াত প্রকাশনী, ঢাকা।
- জামায়াত প্রকাশনী, ঢাকা মহানগরী।
- জামায়াত প্রকাশনী, সাতক্ষীরা।
- জামায়াত প্রকাশনী, যশোর।
- প্রফেসরস বুক কর্ণার, মগবাজার, ঢাকা।
- প্রফেসরস পাবলিকেশন্স, মগবাজার, ঢাকা।
- খন্দকার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।
- আহসান পাবলিকেশন, মগবাজার, ঢাকা।
- আহসান পাবলিকেশন, বাংলা বাজার, ঢাকা।
- একাডেমী লাইব্রেরী দেওয়ানবাজার চট্টগ্রাম।
- তাসনিয়া বই বিতান, মগবাজার ঢাকা।
- সখী বিতান, হাতেম খান, রাজশাহী।
- আলআমিন লাইব্রেরী, সিলেট।
- ইসলামী লাইব্রেরী, বরিশাল।

তাছাড়া বাংলাদেশের বড় বড় শহর কেন্দ্রে অভিজাত ইসলামী লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবাণীতে দারসে হাদীস প্রথম খন্ডের ৬ষ্ঠ মুদ্রণ প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

বইটি প্রকাশের পর আধুনিক ও সাধারণ শিক্ষিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে এবং অল্প দিনের মধ্যে বইটি পঞ্চম মুদ্রণ শেষ হয়ে গেছে। পাঠকদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য করে আর্থিক সংকট থাকার পরেও ৬ষ্ঠ মুদ্রণ প্রকাশিত হলো।

লেখক অধ্যাপক আবদুল মতিন কলেজে অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে কুরআন হাদীস কেন্দ্রীক বই লেখার কাজ অব্যাহত রেখেছেন। ইতোমধ্যেই তাঁর লেখা দারসে হাদীস ১ম ও ২য় খন্ড, দারসে কুরআন ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড, বাংলা উচ্চরণসহ ১০০ মাসনুন দোয়া, নির্বাচিত বিষয় ভিত্তিক হাদীস, কুরআন হাদীসের আলোকে পাঁচ দফা কর্মসূচী, বিষয় ভিত্তিক কুরআন হাদীস সংকলন, ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ, আল কুরআনে মানব সৃষ্টি তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া দারসে কুরআন ৪র্থ, দারসে হাদীস ৩য় খন্ড ও রাসূলুল্লাহ্র (সঃ) রূহানী নামায প্রকাশের পথে।

লেখক আধুনিক ও স্বল্প শিক্ষিতদের মাঝে সহজ-সরল ভাষায় কুরআন হাদীসের বুঝ দেবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে কবুল করার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে কামনা করছি। আর বই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসব ভুল-ত্রুটি রয়ে যাচ্ছে তার জন্য সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

আল্লাহ্ হাফিজ-
প্রকাশক

তারিখ ঃ ১৫-০৮-২০০৮

হাদীস সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

হাদীস কাকে বলে ?

হাদীস ঃ হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ নতুন, যা কাদীম অর্থাৎ পুরাতন শব্দের বিপরীত। তাছাড়া হাদীস অর্থ-কথা, বাণী, সংবাদ, খবর ইত্যাদি।

ইসলামী পরিভাষায় শরীয়তের আদেশ-নিষেধ ও আল-কুরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত মহানবী (সাঃ) এর কথা, কাজ ও সম্মতিকে হাদীস বলে। ইমাম বোখারী (রঃ)-এর মতে উপরোক্ত অর্থ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দৈহিক কাঠামো ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে তাও হাদীস। ব্যাপক অর্থে সাহাবা ও তাবেঈদের কথা, কাজ ও অনুমোদনকেও হাদীস বলে। তবে কেউ কেউ একে 'আসার' বলেছেন।

হাদীস ও সুন্নাহ্র মধ্যে পার্থক্য ঃ শব্দগত ভাবে হাদীস অর্থ-কথা বা বাণী, আর সুন্নাহ্ অর্থ রীতি-নীতি ও পথ বা পন্থা। কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় সুন্নাহ্ ও হাদীসের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। উভয় শব্দ দ্বারাই মহানবী (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈদের কথা, কাজ ও সম্মতিকে বোঝায়।

হাদীসের প্রকারভেদ ঃ

(ক) মূল হিসেবে হাদীসের প্রকার ঃ মূল হিসেবে হাদীসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

যেমনঃ (১) কওলী, (২) ফে'লী, এবং (৩) তাকরীরি।

১। কওলী হাদীস ঃ মহানবী (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈদের কথা জাতীয় হাদীসকে কওলী হাদীস বলা হয়।

২। ফে'লী হাদীসঃ মহানবী (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈদের কর্মসূচক হাদীসকে ফে'লী হাদীস বলা হয়।

৩। তাক্রীরি হাদীসঃ মহানবী (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈদের সম্মতিসূচক হাদীসকে তাক্রীরি হাদীস বলা হয়।

(খ) সনদ হিসেবে হাদীসের প্রকারঃ সনদের দিক থেকে হাদীস তিন প্রকার। যেমনঃ মারফু' (২) মাউকুফ এবং (৩) মাক্তু।

১। মারফু' হাদীসঃ যে হাদীসের সনদ বা বর্ণনাকারীদের সূত্র নবী করীম (সাঃ) পর্যন্ত পৌছেছে। অর্থাৎ যে হাদীস স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) এর হাদীস, তাকে মারফু' হাদীস বলে।

২। মাউকুফ হাদীসঃ যে হাদীসের সনদ বা বর্ণনাকারীদের সূত্র কোনো সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে। অর্থাৎ যা স্বয়ং সাহাবীর হাদীস বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাকে মাউকুফ হাদীস বলে।

৩। **মাক্তু হাদীসঃ** যে হাদীসের সনদ কোনো তাবেঈ পর্যন্ত পৌছেছে। অর্থাৎ তাবেঈদের হাদীস বলে প্রমাণিত। এরূপ হাদীসকে মাক্তু হাদীস বলে।

(গ) স্তর ও সনদ হিসেবে হাদীসের প্রকারঃ স্তর ও সনদ হিসেবে হাদীস দু'প্রকার।

যেমনঃ (১) মুত্তাসিল এবং (২) মুনকাতি।

১। **মুত্তাসিল হাদীসঃ** যে হাদীসের সনদ বা বর্ণনাকারীদের সূত্রে কোনো স্তরে কোনো বর্ণনাকারী বাদ পড়েনি, তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

২। **মুন্কাতি হাদীসঃ** যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোনো স্তরে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে, তাকে হাদীসে মুন্কাতি বলে।

মুত্তাসিল হাদীসের প্রকারঃ বর্ণনা-শৃংখল হিসেবে মুত্তাসিল হাদীস চার ভাগে বিভক্ত; যথাঃ ((i)) মুতাওয়াতির, (ii) মাশহুর, (iii) আজীজ এবং (iv) গরীব।

(i) **মুতাওয়াতিরঃ** যে হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগে বা স্তরে এত বেশী যে, উক্ত হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহের সুযোগ নেই। অথবা কোনো রাবীকে মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দেয়া একেবারেই অসম্ভব, তাকে 'মুতাওয়াতির' হাদীস বলে।

(ii) **মাশহুরঃ** যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগে বা স্তরে কমপক্ষে তিন জনের কম নয় তাকে 'মাশহুর' হাদীস বলে।

(iii) **আজিজঃ** যে হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগে বা স্তরে কমপক্ষে দু'জন থাকে তাকে 'আজিজ' হাদীস বলে।

(iv) **গরীবঃ** যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগে বা স্তরে কমপক্ষে একজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে 'গরীব' হাদীস বলে।

মুনকাতি হাদীসের প্রকারঃ মুনকাতি হাদীস তিন ভাগে বিভক্ত; যথাঃ (i) মুয়াল্লাক, (ii) মু'দাল এবং (iii) মুরসাল।

(i) **মুয়াল্লাক হাদীসঃ** যে হাদীসের সনদের সূত্রের প্রথম দিকে কোনো রাবীর নাম বাদ পড়ে গিয়েছে, তাকে 'মুয়াল্লাক' হাদীস বলে।

(ii) **মু'দাল হাদীসঃ** যে হাদীসের সনদের সূত্রের মাঝখান হতে রাবীর নাম বাদ পড়ে গিয়েছে, তাকে 'মু'দাল' হাদীস বলে।

(iii) **মুরসাল হাদীসঃ** যে হাদীসের সনদের স্তরের শেষের দিকে কোনো রাবীর নাম অর্থাৎ সাহাবার নাম বাদ পড়ে গিয়েছে, তাকে 'মুরসাল' হাদীস বলে।

(ঘ) **বিশুদ্ধতার দিক থেকে হাদীসের প্রকারঃ** বিশুদ্ধতার প্রকৃতি ও ধরণ অনুযায়ী হাদীস তিন প্রকার। যথাঃ (১) সহীহ, (২) হাসান ও (৩) যঈফ।

১। **সহীহ্ হাদীসঃ** যে হাদীসের সনদ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছেদ পড়েনি, যার রাবী বা বর্ণনাকারীরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য এবং তাঁদের

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন অস্‌সালাতু অস্‌সালামু আ'লা সাইয়্যেদিল মুরসালীন, অআ'লা আলেহী আযমায়ীন। আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে দারসে হাদীস প্রথম খন্ড প্রকাশ করতে পেরে তাঁরই দরগায় শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আল-কুরআনের ব্যাখ্যা হলো রাসূল (সঃ) এর হাদীস। সুতরাং কুরআন বুঝতে হলে হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। তাই আমি আল্লাহর নবী (সঃ) এর অসংখ্য হাদীস সমূহের মধ্য থেকে বাছাই করে আধুনিক এবং সাধারণ শিক্ষিতদের নিজে বুঝা এবং অপরকে বুঝানোর উপযোগী করে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় হাদীসের দারস লেখার উদ্যেগ গ্রহণ করি। আল্লাহ পাকের অশেষ মেহের বাণীতে অল্প সময়ের মধ্যে দারসে হাদীস প্রথম খন্ডের পান্ডুলিপি তৈরী করি। যদিও সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে হাদীসের দারস লিখতে ভয় পাচ্ছিলাম। তার পরও আল্লাহর উপর ভরসা রেখে এ কাজটি আঞ্জাম দেই। ইতোমধ্যে আমার লেখা দারসে হাদীস ১ম ও ২য় খন্ড, দারসে কুরআন ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং তার আরও খন্ড লেখা হবে ইন্‌শাআল্লাহ। এই জন্য আমি পাঠক পাঠিকাদের দোআ এবং আল্লাহ পাকের সাহায্য কামনা করছি।

আমি 'দারসে হাদীস' বইটি আধুনিক এবং সাধারণ শিক্ষিত ইসলামী আন্দোলনের ভাই-বোনদের দারস পেশ করার উপযোগী করে লেখার চেষ্টা করেছি। এই জন্য হাদীস নিজে বুঝা ও অপরকে বুঝানোর জন্য হাদীস সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা এবং হাদীস দারস দানের পদ্ধতি-মূল দারস আরম্ভ করার পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাছাড়া হাদীসের সরল অনুবাদের সরল অনুবাদের সাথে সাথে শব্দার্থও লিখে দিয়েছি। বইটির আরও বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো দারসের উপস্থাপনা এমনভাবে করা হয়েছে যেন আপনি নিজেই শ্রোতার সামনে পেশ করছেন।

দারসে হাদীস বইটি লেখা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে যে সমস্ত হীতাকাংখী ভাই ও বোনেরা উৎসাহ, পরামর্শ এবং অর্থ দিয়ে সহযোগীতা করেছেন তাদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। এজন্য আল্লাহপাকের কাছে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

লেখা ও ছাপার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। এজন্য যদি কোনো সুহৃদয় ব্যক্তির দৃষ্টিতে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে আমাকে সরাসরি অথবা পত্রের মাধ্যমে অবহিত করার আহবান জানাচ্ছি এবং পরবর্তীতে তা সংশোধন করার চেষ্টা করবো ইন্‌শাআল্লাহ্‌।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌ পাকের কাছে আমার আরজি, হে আল্লাহ্‌ তাবারাক ওয়া তাআলা! তোমার রাসূলের হাদীসের ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা তুলে ধরতে যেয়ে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল-ত্রুটি ও বারাবাড়ি হয়ে যায় তার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও। আর আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সাদকায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করে আখেরাতে আদালতে নাজাত দান করিও। আমীন!

মুহাম্মাদ আবদুল মতিন
সহকারী অধ্যাপক
ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ
দৌলতপুর কলেজ (দিবা-নৈশ), খুলনা।

উৎসর্গ

কবরে চির শায়িত
আমার পরম শ্রদ্ধেয়
মরহুম আব্বা-আম্মা
ও আত্মীয়-স্বজনদের
মাগফিরাত কামনার্থে।

সূচী পত্র

বিষয়ের নাম **পৃষ্ঠা**

হাদীসের বিষয়

স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর, আর যাতে বৈপরীত্য ও সূক্ষ্ম দুর্বলতাও নেই, তাকে 'সহীহ্ হাদীস' বলা হয়।

২। **হাসান হাদীসঃ** যে হাদীসে সহীহ্ হাদীসের অন্যান্য শর্ত ও গুণ বর্তমান থাকার পরে কেবল রাবীদের স্মরণশক্তি ও বিশ্বস্ততায় কিছুটা ঘাটতি থাকে, সেই হাদীসকে 'হাদীসে হাসান' বলা হয়।

৩। **যঈফ হাদীসঃ** যে হাদীসে সহীহ ও হাসান হাদীসের সকল শর্ত, গুণ বা একটি শর্ত, গুণ পাওয়া যায় না সে হাদীসকে 'যঈফ' হাদীস বলে।

ফকীহ্‌গণ সাধারণতঃ সহীহ ও হাসান হাদীস দ্বারাই আইন প্রণয়নে সাহায্য গ্রহণ করেন। আর যঈফ হাদীস বর্জন করেন। মুহাদ্দিসগণ যঈফ হাদীস সদাসর্বদা বর্জন করেছেন।]

মাউযু হাদীসঃ যে রাবী ইচ্ছা করে মনগড়া কথাকে রাসূলের নামে চালিয়ে দেয়, তাকে মাউযু হাদীস বলা হয়।

[এই হাদীস বর্জন করতে হবে এবং উক্ত রাবীর কোনো হাদীসকে গ্রহণ করা যাবেনা।]

হাদীসে কুদ্‌সীঃ যে হাদীস মহানবী (সাঃ) প্রত্যক্ষ বা সরাসরি ওহী ছাড়া গোপন ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে মূল ভাষা ও ভাব আল্লাহ্‌র নিকট হতে পেয়েছেন এবং তিনি তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন, তাকে 'কুদসী' হাদীস বলে।

কুরআন এবং হাদীসের মধ্যে পার্থক্য ঃ

আল-কুরআন হচ্ছে প্রত্যক্ষ বা সরাসরি অহী যাকে "অহীয়ে মাতলু" বলা হয়, যা নামাযে পাঠ করা যায়। অপর পক্ষে হাদীস হচ্ছে প্রচ্ছন্ন বা অপ্রকাশিত অহী। ভাব আল্লাহ্‌র কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের ভাষায় তা প্রকাশ করেছেন। যাকে "অহীয়ে গায়ের মাতলু" বলা হয়। যা নামাযে পাঠ করা যায় না।

সিহাহ্ সিত্তাহ্ বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস এবং তার গ্রন্থকারদের নাম ঃ

ক্রঃ নং	হাদীস গ্রন্থের নাম	সংকলকের নাম	জন্ম	মৃত্যু
১	বুখারী শরীফ	ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (রহঃ)	১৯৪ হিজরী	২৫৬ হিজরী
২	মুসলিম শরীফ	ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী (রহঃ)	২০৪ হিজরী	২৬১ হিজরী
৩	নাসায়ী শরীফ	ইমাম আবদুর রহমান ইবনে শুআইব নাসায়ী (রহঃ)	২১৫ হিজরী	৩০৩ হিজরী
৪	আবু দাউদ শরীফ	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আশজাস আস সিজিস্তানী (রহঃ)	২০২ হিজরী	২৭৫ হিজরী
৫	তিরমিযী শরীফ	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ইসা আত তিরমিযী (রহঃ)	২০৯ হিজরী	২৭৯ হিজরী
৬	ইবনে মাজাহ্ শরীফ	আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ওয়াহিদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাজাহ্ (রহঃ)	২০৯ হিজরী	২৭৩ হিজরী

বিশিষ্ট হাদীস বর্ণনাকারী বা রাবীদের তালিকা ঃ

আজ দুনিয়ায় হাদীসের যে ইল্ম ছড়িয়ে আছে তার সাথে প্রায় দশ হাজার সাহাবার নাম জড়িত দেখা যায়।

সাহাবাদের মধ্য থেকে যারা সবচেয়ে বেশী হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	রাবীর নাম	মৃত্যু	বয়স	হাদীস বর্ণনার সংখ্যা
১	হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)	৫৭ হিজরী	৭৮ বছর	৫,৩৭৪ টি
২	হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)	৫৮ হিজরী	৬৭ বছর	২২১০ টি
৩	হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)	৬৮ হিজরী	৭১ বছর	১৬৬০ টি
৪	হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)	৭০ হিজরী	৮৪ বছর	১৬৩০ টি
৫	হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)	৯৩ হিজরী	১০৩ বছর	১২৮৬ টি
৬	হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)	৭৪ হিজরী	৯৪ বছর	১,৫৪০ টি
৭	হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)	৪৬ হিজরী	৮৪ বছর	১,১৭০ টি
৮	হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)	৩২ হিজরী	৮৪ বছর	৮৪৮ টি
৯	হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আসা(রাঃ)	৬৩ হিজরী	-	৭০০ টি

হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষাঃ

ছাহাবীঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন, বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথবা একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যু বরণ করেছেন, তাঁকে 'সাহাবী' বলে।

তাবেঈঃ যিনি কোনো সাহাবীর কাছে হাদীস শিক্ষা করেছেন কিংবা তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁকে তাবেঈ বলে।

তাবে তাবেঈঃ যিনি কোনো তাবেঈর কাছে হাদীস শিক্ষা করেছেন কিংবা তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে তাবে-তাবেঈ বলে।

রাবীঃ হাদীস বর্ণনাকারীকে রাবী বলে।

রেওয়ায়াতঃ হাদীস বা আসার বর্ণনা করাকে 'রেওয়ায়াত' বলে।

সনদঃ রাবীদের পরস্পরাকে 'সনদ' বলে।

রেজালঃ হাদীসের রাবীদের সমষ্টিকে 'রেজাল' বলে।

আসমাউর রেজালঃ যে শাস্ত্রে রাবীদের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে, তাকে 'আসমাউর রেজাল' বলে।

মতনঃ সনদ বর্ণনা করার পর হাদীসের যে মূল কথাটি বর্ণনা করা হয়, তাকে 'মতন' বলে।

শায়খঃ হাদীস শিক্ষাদাতা রাবীকে 'শায়খ' বলা হয়।

মোহাদ্দেসঃ যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন, তাঁকে 'মোহাদ্দেস' বলে।

হাফেজঃ সাহাবা ও তাবেঈদের যুগের পর যিনি সনদ ও মতনের সব বৃত্তান্তসহ এক লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাঁকে 'হাফেজ' বা 'হাফেজে হাদীস' বলা হয়।

হুজ্জাতঃ যিনি অনুরূপভাবে তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাঁকে 'হুজ্জাত' বলা হয়।

হাকেমঃ আর যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাঁকে 'হাকেম' বলা হয়।

শায়খাইনঃ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমকে এক সংগে 'শায়খাইন' বলে।

সেহাহ্ সেত্তাহ্ঃ সেহাহ্ অর্থ- বিশুদ্ধ আর সেত্তাহ্ অর্থ-ছয়। অর্থাৎ বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, তিরমিযী শরীফ, নাসাঈ শরীফ ও ইবনে মাজাহ শরীফ এই ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থকে 'সেহাহ্ সেত্তাহ্' বলা হয়।

সহীহাইনঃ বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফকে একত্রে 'সহীহাইন' বলা হয়।

সুনানে আরবাঃ সেহাহ্ সেত্তার অপর চারটি কিতাব যেমন- আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্ শরীফকে একত্রে 'সুনানে আরবা' বলা হয়।

মুত্তাফিকুন আলাইহেঃ যে হাদীসকে একই রাবী থেকে ইমাম বুখারী এবং মুসলিম উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে হাদীসে 'মুত্তাফিকুন আলাইহে' বলা হয়।

হাদীস সংরক্ষিত কিভাবে হলোঃ

আল-কুরআনের পর হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। কুরআন যেভাবে নাযিলের সময় গুরুত্বের সাথে নিয়মিত ভাবে লিপিবদ্ধ হয়, হাদীস ঠিক সেভাবে রাসূলের আমলে নিয়মিত ভাবে লিপিবদ্ধ না হলেও নিম্নের কয়েকটি পদ্ধতিতে হাদীস বর্তমান পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে।

হাদীস শিক্ষালাভের মাধ্যমেঃ আল্লাহ্ পাক অসাধারণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন আরব জাতিকে মহানবী (সাঃ)-এর নবুওয়াত ও তাঁর হাদীস সংরক্ষক

হিসেবে মনোনীত ও নিযুক্ত করেছিলেন। সাহাবাগণ রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস জানার জন্য নিজেদের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সাহাবাগণ পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে হাদীস শিক্ষা লাভ করতেন। তাছাড়া হুজুরের দরবারে উপস্থিত হয়েও তাঁরা হাদীস শিক্ষা করতেন। শুধু তাই নয়, একজন সাহাবা অন্য একজন সাহাবার নিকট হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শত শত মাইলের দূর-দূরান্ত পথ পায়ে হেঁটে সফর করতেন।

হাদীস মুখস্ত করণের মাধ্যমেঃ হাদীস সংরক্ষণের জন্য সাহাবাগণ কুরআন মজীদের মতই রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস মুখস্ত ও আলোচনা করতেন। এ ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "আমরা হুজুরের জীবদ্দসায় হাদীস মুখস্ত করতাম।"

মহানবী (সাঃ) হাদীস সংরক্ষণ ও প্রচারের উপর গুরুত্ব তুলে ধরে বলেনঃ "আল্লাহ্ তার জীবন উজ্জ্বল করবেন, যে আমার কথা শুনে তা মুখস্ত করলো এবং সঠিক ভাবে স্মরণ রেখে এমন লোকের কাছে পৌছে দিলো যে তা শুনতে পায়নি।" (তিরমিযী ও উমদাতুলকারী)

হাদীস শিক্ষাদানের মাধ্যমেঃ সাহাবারা নিজেদের হাদীস বা শিক্ষা লাভের মতো অন্যদের কাছে তা প্রচার বা পৌছে দেয়া অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাই তারা রাসূল (সাঃ)-এর দরবার থেকে হাদীস শিখে তা অন্যদেরকে শিক্ষা দিতেন। বিশেষ করে নবী করীম (সাঃ) মৃত্যুর পর সাহাবাদের এক বিরাট দল ঐ কর্তব্য পালনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং গোটা আরব ভূমিকে হাদীসের আলোকে আলোকিত করে তোলেন।

(৪) **বিক্ষিপ্তভাবে হাদীস লেখার মাধ্যমেঃ** হাদীস লেখার ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) নিয়মিত ব্যবস্থা না করলেও কোনো কোনো সাহাবার জন্য তিনি হাদীস লিখে দেবার ব্যবস্থা করেন। হযরত আবু হুরাইরার বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে "রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবু শাহ্ ইয়ামানীকে হাদীস লিখে দেবার ব্যবস্থা করেন"। অনেক লেখা-পড়া জানা সাহাবা হাদীস

লিখে নিতেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ)-এর নিকট রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসের একটি নোট বই ছিলো। সেটিকে তিনি 'সাদেকাহ্' নাম দিয়েছিলেন। এভাবে বিক্ষিপ্তভাবে হযরত আলী ও (রাঃ) হাদীস লিখে রাখতেন।

হাদীস সংগ্রহে সতর্কতার মাধ্যমেঃ প্রকৃত হাদীস সংরক্ষণের জন্য মুহাদ্দিসগণ যেভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতেন তার তুলনা নেই। কথিত আছে, ইমাম বুখারী (রঃ) একটি হাদীস সংগ্রহ করার জন্য শত শত মাইল দূরে অবস্থানকারী এক লোকের কাছে সফর করে হাজির হয়ে দেখতে পান, লোকটি তার উঁটকে ধরার জন্য খাবার বিহীন পাত্র দিয়ে ফাঁকি দিয়ে ডেকে ধরে ফেলে। তার এই প্রতারণা দেখে তিনি তার কাছে আর হাদীস না শুনেই চলে আসেন। হযরত আবু আইউব আনসারী একটিমাত্র হাদীস নিজ কানে শোনার জন্য মদিনা থেকে সফর করে মিশরে গিয়েছিলেন।

তাবেঈদের প্রতি নির্দেশের মাধ্যমেঃ সাহাবাগণ কেবলমাত্র নিজেরাই হাদীস রক্ষণাবেক্ষণ করে ক্ষান্ত হননি, তাবেঈদের প্রতিও তাঁরা অনুরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ) তাঁর শিষ্যদের বলতেনঃ "তোমরা যখন পরস্পর মিলিত হবে তখন বেশী বেশী করে হাদীস আলোচনা করবে।"

পরিশেষে বলা যায় যে, মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য মহামূল্যবান হাদীস সাহাবা, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ এবং মুহাদ্দিসগণের ত্যাগ-তিতিক্ষা, সতর্কতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই সর্বযুগের জন্য আমরা হাদীসগুলোকে বিশুদ্ধ ভাবে কয়েকটি হাদীস গ্রন্থের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ আকারে পেয়েছি।

হাদীস কিভাবে সংকলিত হলোঃ

ইসলামী ব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে আল-হাদীস। পবিত্র কুরআনের পরই হাদীসের স্থান। কিন্তু কুরআনের কোনো সূরা বা আয়াত নাযিল হবার সাথে সাথে যেভাবে তা গুরুত্ব দিয়ে লেখার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হতো, প্রথম দিকে তেমন ভাবে হাদীস লিখে রেখে সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এমনি ভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও হাদীস সংকলনের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়নি। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী উৎসের মাধ্যমে সাহাবাগণ বিশুদ্ধ হাদীস সংকলন করেন।

মহানবী (সাঃ)-এর হাদীসগুলো সাহাবাগণ অত্যন্ত মনোযোগের সাথে মুখস্ত করে সংরক্ষণ করতেন এবং অনেকেই কিছু কিছু হাদীস লিখে রাখতেন। এভাবে হাদীস সংকলনের সূত্রপাত হলেও হাদীস সংকলন সমাপ্ত হয় আরো অনেক পরে।

রাসূলের যুগে হাদীস সংকলন না করার কারণঃ রাসূলের জীবনকালে হাদীস সংকলন না করার প্রধান কারণ হলো রাসূল (সাঃ) কাউকে হাদীস লেখার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেননি। তিনি এ ব্যাপারে কাউকে নিষেধও করেননি আবার আদেশও দেননি। তাছাড়া আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিলো এই যে, হযরত উমর (রাঃ) হাদীস লিখে রাখার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি আশংকা করেছিলেন যে, হয়তো হাদীসগুলো লিখে রাখলে তা কুরআন শরীফের সাথে মিশে যেতে পারে এবং কুরআন থেকে পৃথক করা সম্ভব নাও হতে পারে।

হাদীস সংকলনের সূত্রপাতঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় হাদীস একত্রিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়নি। সে সময় সাহাবাদের নিয়ম ছিলো তাঁরা একে-অপরের কাছ থেকে মৌখিকভাবে হাদীস শুনতেন এবং তা মনে রাখতেন। তখন কোনো হাদীসের সত্যতা বা বিশুদ্ধতা যাঁচাইয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সাহাবাগণ সরাসরি রাসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকে

তার সমাধান করে নিতেন। খেলাফতের যুগেও তা করা সম্ভব ছিলো। কিন্তু তাঁদের ওফাতের পর যখন মুসলমানগণ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন এবং রাজধানী মদিনা থেকে স্থানান্তরও হয়ে যায় তখন বিভিন্ন কারণে বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, আর তখনই হাদীস সংকলনের সূত্রপাত ঘটে।

হাদীস সংকলনের প্রথম পদক্ষেপঃ যদিও মহানবী (সাঃ) হাদীস সংকলনের ব্যাপারে কাউকে আদেশ কিংবা নিষেধ করেননি, তবু তাঁর জীবদ্দশায়ই হাদীস লেখার প্রথা চালু ছিলো। যেমনঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর অনুমতি নিয়ে প্রায় এক হাজার হাদীসের পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছিলেন। তাছাড়া হযরত আলী (রাঃ) নিজেও হাদীস লিখে রাখেন এবং তার নাম দেয়া হয় 'সহীফায়ে আলী'। এছাড়া হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) নিজে এবং তাঁর ছাত্ররাও হাদীস লিখে রাখতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) সহ বড় বড় হাদীসের বর্ণনাকারীদের শিষ্য বা ছাত্র তাঁদের বর্ণনাগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখেন।

তাবেঈদের যুগে হাদীস সংকলনঃ সাহাবাদের পর আসে তাবেঈদের যুগ। এ যুগে হাদীস তখন নিয়মিত ভাবে গ্রন্থবদ্ধ করার কাজ শুরু না হলেও যেসব সাহাবাদের কাছে হাদীস লিখিত ভাবে ছিলোনা তাঁরা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ তাদেঈগণ তাঁদের জানা হাদীসগুলো লিখে ফেলেন।

দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরু থেকে এ প্রচেষ্টা একটা নতুন মোড় নেয়। তাবেঈদের একটা বিরাট দল হাদীস সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ ধারা চলে প্রায় হিজরী দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলিফা যাকে দ্বিতীয় উমর বলা হয়-হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয আনুষ্ঠানিক ভাবে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রদেশের

দায়িত্বশীলদের কাছে হাদীস সংকলনের জন্য নোটিশ জারি করেন। ফলে হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামেশকে পৌঁছতে থাকে। খলিফা সেগুলোর কপি করে গোটা ইসলামী রাষ্ট্রের কাছে ছড়িয়ে দেন। এ যুগেই ইমাম মালেক মদীনায় বসে তাঁর "মুয়াত্তা" হাদীসগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। এটা সর্বপ্রথম লিখিত বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ। এতে ১,৭০০ হাদীস লিপিবদ্ধ হয়। এছাড়া এ যুগের আরো উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংকলিত হাদীসগ্রন্থ হলো, 'জামে' 'সুফিয়ান সূরী," "জামে ইবনে মুবারক," 'জামে ইমাম আওযাঈ," 'জামে ইবনে জুরাইজ', কাযী আবু ইউসুফের "কিতাবুল খারাজ" ও ইমাম মুহাম্মদের "কিতাবুল আসার।"

হাদীস সংকলনের বিশেষ প্রয়োজন কেন দেখা দিলোঃ

হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিকে উমাইয়া খলিফাদের অত্যাচারের ফলে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যাপারে বেশ কতকগুলো দল ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তার মধ্যে খারিজী, শিয়া, মুতাজিলা ও সুফী সম্প্রদায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য নিজেদের মনগড়া কথাকে রাসূলের হাদীস বলে প্রচার করতে থাকে। তাদের এ মিথ্যা দাবী খন্ডনের জন্য সুন্নী ও খারিজিরা "আমি নবী, আমার কোনো উত্তরাধিকারী নেই"- রাসূলের এ হাদীসটি বর্ণনা করে তাদের মিথ্যা প্রচারণা বন্ধ করে। এমনিভাবে যখন বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায় অসংখ্য কল্পিত কথা রচনা করে রাসূলের হাদীস বলে চালাতে লাগলো তখন একদল সত্যের অনুসারী রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রকৃত হাদীসগুলোকে একত্রিত করে কিতাব আকারে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা বলে মনে করে এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

বিশুদ্ধ হাদীস সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধ করণঃ

হাদীস যাঁচাই-বাছাই করে নিয়মিত ভাবে হাদীস সংকলনের ব্যাপক কাজটি চলে তৃতীয় যুগ অর্থাৎ হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষের দিক থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত।

এ যুগে রাসূলের বাণী এবং সাহাবা ও তাবেঈদের উক্তির মধ্যে পার্থক্য করা হয়। প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে লিখা হয়। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পাওয়া হাদীসের পৃথক সংকলন করা হয়। এ যুগে মুহাদ্দীসদের সংগৃহীত হাদীসের বিপুল স্তূপ থেকে সহীহ ও নির্ভুল হাদীস ছাঁটাই-বাছায়ের কাজও শুরু হয়ে যায়। এ ছাঁটাই-বাছায়ের প্রয়োজন এজন্য দেখা দেয় যে, ইতিমধ্যেই একদল লোক মিথ্যা ও মনগড়া হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করেছিলো। তবে এধরনের মিথ্যা হাদীস রচনাকারীদের সংখ্যা ছিলো অতি নগণ্য। কেননা রাসূল (সাঃ) নিজেই এ ব্যাপারে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলে গেছেন "যারা আমার নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নামে।"

রাসূলের এই হুঁশিয়ারী উচ্চারণের কারণে ভন্ড, নির্বোধ ও কুচক্রীর সংখ্যা সীমিত পর্যায়েই ছিলো। রাসূল (সাঃ) এর প্রকৃত হাদীস যাঁচাই-বাছায়ের কাজে যেসব মুহাদ্দীসগণ আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী ও মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী (রঃ)। এরা দু'জন ছাড়া আরও শত শত মুহাদ্দিস তাঁদের গোটা জীবনকে এ কাজে ব্যয় করেন।

এ যুগে একদিকে যেমন হাদীস যাঁচাই-বাছায়ের কাজ চলছিলো তেমনি অন্যদিকে চলছিলো সহীহ হাদীসগুলো নিয়মিত ভাবে লিপিবদ্ধ করার কাজ। এ যুগে এ কাজটি হয় অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে। শত শত মুহাদ্দীস

নিজেদেরকে এ কাজে নিয়োজিত করেন। হাদীস সংগ্রহের জন্য তাঁরা হাজার হাজার মাইল সফর করেন। শত শত ওস্তাদের কাছে পাঠ নেন। রাবীদের অবস্থা জানার জন্যও অমানুসিক পরিশ্রম করেন। হাদীসের বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য প্রায় একশোটি শর্ত আরোপ করেন। এভাবে তাঁরা মান অনুযায়ী হাদীস লিপিবদ্ধ করেন।

তবে এ যুগের হাদীস সংকলকদের শীর্ষস্থানে আমরা পাই নীচের সাত জনকে– (১) মুসনাদের সংকলক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, (২) বুখারীর সংকলক মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল। (৩) মুসলিমের সংকলক, মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ। (৪) আবু দাউদের সংকলক, ইমাম আবু-দাউদ সাজিস্তানী। (৫) নাসাঈর সংকলক, আহমদ ইবনে শো'আইব, (৬) তিরমিযীর সংকলক, ইমাম আবু ঈসা এবং (৭) ইবনে মাজাহ্র সংকলক, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্। এদের মধ্যে একমাত্র ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের 'মুসনাদ' ছাড়া বাকি ছ'টি হাদীসের কেতাবকে 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' বলা হয়।

হাদীস দারস দেবার সমস্যা ঃ

কুরআনের দারস দেয়া যতো সহজ হাদীসের দারস দেয়া ততো সহজ নয়। তার কারণ হলো আল-কুরআনের দারস দেবার জন্য যেমন করে নাযিলের সময়কাল, প্রেক্ষাপট, শানে নুযূল এবং ব্যাখ্যার জন্য হাদীসের রিফারেন্স পাওয়া যায়, হাদীসের দারসের ক্ষেত্রে সেভাবে পাওয়া যায় না। অসংখ্য হাদীস মহানবী (সাঃ) এর জীবনে পাওয়া যায়। তার মধ্যে তিনি মক্কায় কোনটি বলেছেন এবং মদীনায় কোনটি বলেছেন, পৃথক ভাবে তা জানা যায় না। কোন্ কারণে তিনি কোন্ হাদীসটি বলেছেন, তাও স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে অনুমান করে হাদীসের দারস পেশ করতে

হয়। তবে স্থান, কাল, পাত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি তাঁর হাদীস পেশ করেছেন। যেমন, ফে'লী বা কথাসূচক হাদীসের মধ্যে দেখা যায় কোন ব্যক্তি হয়তো তার মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার করে না অথবা তার রাগ বেশী, তিনি যখন রাসূলকে জিজ্ঞেস করেছেন কোন্ আ'মলটি সর্বউত্তম ? তখন তিনি তার মধ্যে যে আ'মলটি নেই সেটিকেই তার জন্য উত্তম আ'মল বলেছেন। তাছাড়া মদীনায় হিজরাত করার পেছনে কিছু লোকের মেয়েদের বিয়ে করার উদ্দেশ্য ছিলো, তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিয়াতের হাদীসটি বর্ণনা করেন।

তাকরীরি বা সম্মতিসূচক হাদীসের মধ্যে পাওয়া যায়, সাহাবীরা একবার গুহী সাপ খাচ্ছিলেন, তিনি নিজে খেলেন না কিন্তু তাদেরকে নিষেধও করলেন না। এভাবে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়।

তাছাড়া পবিত্র কালামে হাকীম আল-কুরআনের আয়াত যেমন নির্ভেজাল, সন্দেহ মুক্ত। কিন্তু সকল হাদীস নির্ভেজাল এবং সন্দেহমুক্ত নয়। তাকে যাঁচাই-বাছাই করতে হয়। কেননা, হাদীসের কেতাবের মধ্যে অসংখ্য যঈফ (দুর্বল), মওযু (মনগড়া কথা) এবং জাল বা মিথ্যা হাদীস পাওয়া যায়। যেগুলো আমাদের সমাজে খুব ভালোভাবে প্রচলিত আছে এবং কেউ কেউ আ'মল করেও যাচ্ছে। সেই সবের মধ্যে অনেক হাদীস দ্বারা সাধারণ আলেম-ওলামারা ওয়াজ-নাসিহতও করে যাচ্ছেন। অথচ মুহাদ্দেসগণ এগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন। সুতরাং হাদীস দারসের ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াতের মতো সন্দেহমুক্ত ভাবে দারস পেশ করা যায় না। বরং যাঁচাই-বাছাই করতে হয়। এজন্য এলেম-কালামেরও বেশ প্রয়োজন। যারা মিথ্যা হাদীস রচনা করে তাদের পরিণতি সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেন ঃ "যে আমার নামে মিথ্যা কথা রচনা করে হাদীস বলে চালিয়ে দেয় তার ঠিকানা হবে জাহান্নামে"

হাদীস দারস দানের পদ্ধতি ঃ

আল-কুরআনের শিক্ষা সহজভাবে তুলে ধরার জন্য যেমন ভাবে ধারাবাহিক কতকগুলো পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। তেমনি ভাবে হাদীসের শিক্ষাও সহজভাবে তুলে ধরার জন্য দারসের কতিপয় পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। তবে এটা ঠিক যে কুরআন দারসের জন্য যেমন ভাবে ধারাবাহিক পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়, হাদীসের ক্ষেত্রে ঠিক সেভাবে সব সময় পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তার পরেও সম্ভাব্য যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

হামদ সানা এবং তাসমিয়া পাঠ ঃ

দারসে হাদীসে মূল হাদীস পাঠের প্রথমেই আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা এবং রাসূল (সাঃ) এর ওপর সালাম পেশ করতে হবে। এর পর আউযু এবং বিস্‌মিল্লাহ্ দিয়ে হাদীস পাঠ করা শুরু করতে হবে।

স্পষ্ট এবং বিশুদ্ধভাবে হাদীস পাঠ ঃ

উপস্থিত শ্রোতাদের সামনে যে হাদীস থেকে আপনি দারস পেশ করতে চান, সেই হাদীসটি স্পষ্ট এবং বিশুদ্ধভাবে সনদসহ পাঠ করতে হবে। তবে দারসে কুরআনের ক্ষেত্রে যেমন সুন্দর লেহান বা সূরের সাথে তেলাওয়াত করতে হয়। হাদীসের ক্ষেত্রে তেমনিভাবে লেহান বা সূর দিয়ে পড়া যায় না। যেভাবে রিডিং পড়তে হয়, ঠিক সেইভাবে পড়তে হবে। তবে পূর্বেই হাদীসটি ভাল ভাবে পড়ে আসতে হবে। যাতে করে বেধে বেধে না যায়। কেননা, কুরআন যেভাবে সহজে তেলাওয়াত করা যায় হাদীস সেভাবে অত সহজে পাঠ করা যায় না।

অনুবাদ ঃ হাদীসটি পাঠ করার পর শ্রোতাদের উপযোগী সহজ সরল ভাষায় অনুবাদ পেশ করতে হবে। পারলে শাব্দিক বা বাক্যগত ভাবে অনুবাদ পেশ করার চেষ্টা করতে হবে।

সম্বোধন ঃ হাদীস পাঠ এবং অনুবাদ করার পর মাহফিল বা প্রোগ্রামে উপস্থিত শ্রোতাদেরকে (পরুষ-মহিলা থাকলে উভয়কেই) সম্মানজনক ভাবে সম্বোধন করতে হবে এবং সালাম পেশ করতে হবে।

রাবীর পরিচয় ঃ হাদীস পাঠ, অনুবাদ এবং সম্বোধন করার পর হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরতে হবে। পরিচয়ের মধ্যে থাকবে ঃ রাবীর নাম, ডাক নাম, কুনিয়াত বা উপাধি। পিতা-মাতার নাম। জন্ম এবং মৃত্যু তারিখ। ইসলাম কবুল করার তারিখ বা বছর। রাবীদের মধ্যে তাঁর অবস্থান এবং হাদীস বর্ণনার সংখ্যা ইত্যাদি।

হাদীসটি গ্রহণকারী কেতাবের পরিচয় ঃ অতঃপর হাদীসটি যেই কিতাবে বর্ণিত হয়েছে সেই হাদীসের কেতাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরতে হবে। হাদীসের কেতাব এবং হাদীসটির অবস্থান তুলে ধরতে হবে। সেহাহ্ সেত্তার কেতাব হলে তার অবস্থান এবং হাদীসটি সহীহ্ না যঈফ না অন্য কিছু। আর তা গ্রহণযোগ্য কি না তাও তুলে ধরার চেষ্টা করতে হবে।

হাদীসটি বর্ণনার প্রেক্ষাপট বা কারণ ঃ যদিও আল-কুরআনের সূরা বা আয়াতের যেভাবে নাযিলের সময়কাল, প্রেক্ষাপট বা পটভূমি কিংবা কারণ পাওয়া যায়। তেমন ভাবে হাদীসের ক্ষেত্রে তা পাওয়া যায় না। তার পরও যেসব হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রেক্ষাপট বা কারণ পাওয়া যায় তা উপস্থাপন করার চেষ্টা করতে হবে।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটি পরিষ্কার হবার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পেশ করার পর শব্দ শব্দ ভাবে অথবা বাক্যগত ভাবে ব্যাখ্যা পেশ করতে হবে। ব্যাখ্যা পেশের সময় রিফারেন্স হিসেবে অন্যান্য হাদীস বা কোরআনের কোটেশন পেশ করার চেষ্টা করতে হবে। তৎকালীন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে মিল রেখে ব্যাখ্যা পেশ করতে হবে।

শিক্ষা ঃ হাদীসটি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং ব্যাখ্যা পেশ করার পর হাদীসের মধ্যে কি কি শিক্ষনীয় এবং করণীয় রয়েছে তা ধারাবাহিক ভাবে পয়েন্ট আকারে বর্ণনা করতে হবে। তার কারণ আল-কুরআন যেমন সার্বজনীন, সকল যুগ বা কালের জন্য প্রযোজ্য। ঠিক তেমনি ভাবে হাদীসও সকল যুগ বা কালের জন্য উপযোগী এবং প্রযোজ্য। সুতরাং সেভাবেই যুগ বা সময়ের সাথে সম্পর্ক রেখে ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

প্রশ্ন উত্তর ঃ উপস্থিত শ্রোতাদের মাঝে হাদীসের ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা তুলে ধরার পর স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগতে পারে আবার নাও পারে। এজন্য পরিবেশ এবং সময়ের প্রতি খেয়াল রেখে প্রশ্ন আহবান করা যেতে পারে। তবে প্রশ্নের ধরনে নিজের মনপূত না হলেও তাকে কটাক্ষ করা যাবে না। বরং ধৈর্য্যের সাথে স্পষ্টভাবে উত্তর দিতে হবে। তাৎক্ষণিক ভাবে উত্তর দিতে না পারলে সময় চেয়ে নিতে হবে, গোজামিলের আশ্রয় নেয়া যাবে না। কেননা, গোজামিলের থেকে সময় চেয়ে নিয়ে উত্তর দেয়া পান্ডিত্যের লক্ষণ।

আহবান ঃ সব শেষে মজলিশে বা প্রোগ্রামে উপস্থিত সকল শ্রোতাদের সামনে হাদীসটি দারসের ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। তার পর সকলকে (নিজেকেসহ) উক্ত হাদীসের শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে আ'মল বা কার্যকর করার আহবান জানাতে হবে এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করে সালাম দিয়ে দারস শেষ করতে হবে।

এক

বিশুদ্ধ নিয়াত

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ -اَمَّا بَعْدُ
اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّاب رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّمَاالْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِامْرِاٍمَا نَوٰى-فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ- وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِامْرَاةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ- (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হাদীসের অনুবাদ ঃ হযরত উমর বিন্ খাত্তাব রাযি আল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ জনাবে রাসূলুল্লাহ্ সল্লাললাহু আলাইহি অয়া সাল্লাম বলেছেনঃ নিয়াতের (বিশুদ্ধতার) উপরই সকল কাজের (ফলাফল) নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য (কাজের ফল) তাই রয়েছে; যা সে নিয়াত করে করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি হিজরত করে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। প্রকৃতপক্ষে তার হিজরত আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের জন্যেই হয়ে থাকে। আর যে হিজরত করে দুনিয়ার (সুযোগ-সুবিধা লাভের)আশায় অথবা কোনো মেয়েলোককে বিয়ে করার (গোপন) বাসনায়; তবে তার হিজরত সেদিকেই হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।

(বুখারী মুসলিম)

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ عَنْ - থেকে বা হতে। اِبْنُ –ছেলে বা সন্তান। قَالَ- বলেন বা বলেছেন। اِنَّمَا –নিশ্চয় নির্ভর করে اَلْاَعْمَالُ –কর্ম বা কাজসমূহ بِالنِّيَّاتِ – নিয়াতের উপর। وَ-এবং। اَلْاِمْرِءِ –প্রত্যেক ব্যক্তি। مَانَوٰى –যা সে নিয়াত করেছে। - فَمَنْ –অতঃপর যে বা যার। كَانَتْ –হবে। فَهِجْرَتُهٗ –তার হিজরত। اِلٰى –দিকে বা জন্য। فَهِجْرَتُهٗ- –বস্তুতঃ তার হিজরত হবে । اِلٰى دُنْيَا- দুনিয়ার খেয়ালে বা উদ্দেশ্যে। يُصِيْبُهَا উহার দিকে নিপতিত হবে। اَوْ –অথবা।اِمْرَاَةٍ– নারী। يَتَزَوَّجُهَا–তাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে। فَهِجْرَتُهٗ –সুতরাং তার হিজরত হবে। اِلٰى –দিকে। مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ –যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করে।

সম্বোধন ঃ দারসে হাদীস মাহফীলে/প্রোগ্রামে উপস্থিত প্রিয় দ্বীনদার/ ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/ বোনেরা/ ভাই ও বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে হাদীস গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব বুখারী এবং মুসলিম শরীফে উল্লেখিত বিশিষ্ট সাহাবী এবং রাবী হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসটি পাঠ এবং অনুবাদ করেছি। আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তাআলা যেন আমাকে আপনাদের সামনে হাদিসটির সঠিক ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা তুলে ধরার তাওফীক দান করেন। "অমা তাওফীকি ইল্লাহ্ বিল্লাহ্।"

রাবী বা বর্ণনাকারীর পরিচয় ঃ হাদীসটির রাবী দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)। তাঁর নাম উমর। ডাক নাম আবুল হাফ্‌স; উপাধি ফারুক। পিতার নাম খাত্তাব ও মাতার নাম খাত্‌না।

তিনি হিজরতের প্রায় ৪০ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং আতোতায়ী আবু লুলুর তরবারীর আঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ২৪শে

হিজরীর ১লা মহররম মদীনায় খেলাফত পরিচালনা কালে শাহাদাৎ বরণ করেন। তিনি প্রায় ১০ বছর সময় ধরে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

হযরত উমর (রাঃ) নবুয়তের মধ্যবর্তী সময়ে (নবুয়তের) ৭ম বছর ঈমান আনেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নবুয়াত লাভের পর থেকে যতজন ঈমান আনেন তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন ৪০তম ব্যক্তি। রাসূল (সাঃ) এর হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি একজন বিশিষ্ট বর্ণনাকারী ছিলেন।

হাদীসটি গ্রহণকারী কিতাব দু'টির পরিচয় ঃ 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠগ্রন্থদ্বয় বুখারী এবং মুসলিম শরীফে হাদীসটি একই রাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হাদীসটি যে বিশুদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য এতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বুখারী শরীফ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ আসমানের নীচে এবং জমীনের উপর আল-কুরআনের পরে যদি কোন বিশুদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে থাকে তবে তা হলো বুখারী শরীফ। বুখারী শরীফের পরেই মুসলিম শরীফের স্থান। অত্র হাদীস গ্রন্থ ছাড়া আরও অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থেও নিয়তের হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদীসটি বর্ণনা করার কারণ বা প্রেক্ষাপট ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাদীসটি যে কারণে বর্ণনা করেছিলেন তার প্রেক্ষাপট হিসেবে দু'টি ঘটনা উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে প্রথম কারণটি দ্বিতীয় কারণ হতে কম নির্ভরযোগ্য।

প্রথম কারণ ঃ মহানবী (সাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে আসার পর এক ব্যক্তি তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বলতে থাকে "আনা মুহাজেরুন" "আনা মুহাজেরুন"। (আমি হিজরতকারী)। এতে মহানবী (সাঃ) এর সন্দেহ হয় যে, সবাই তো হিজরত করে আসলো কিন্তু কেউ

তো একথা বললো না। তখন তিনি ঐ লোকটির হিজরত করার কারণ খুঁজতে গিয়ে জানতে পারলেন যে, রাসূল (সাঃ) এর সাথে হিজরতকারীদের মধ্যে এমন একজন সুন্দরী মহিলা ছিলো যাকে ঐ লোকটি ভালবাসতো। তাই সে উক্ত সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করার বাসনা নিয়ে হিজরত করে মদীনায় চলে আসে। তখন রাসূল (সাঃ) উক্ত নিয়তের হাদীসটি বর্ণনা করেন।

দ্বিতীয় কারণ ঃ মহানবী (সাঃ) হিজরত করে মদীনায় আসার পর দেখতে পেলেন মক্কার মতই মদিনার লোকদের মধ্যেও আরবী অনআরবী-জাহেলী জাতীয়তাবাদ চালু আছে। তারা একে অপরের উপর নিজেদেরকে বিশেষ মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী মনে করতো। এর কারণে আরবী অনেন। আরবীদের মধ্যে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠতো না এবং বিয়ে--সাদীও দিত না। মহানবী (সাঃ) মদীনায় আগমন করে যখন ঘোষণা দিলেন অনআরবীদের উপর যেমন আরবীদের বিশেষ কোন মর্যাদা নেই তেমনিভাবে আরবীদের উপরও অনআরবীদের বিশেষ কোন মর্যাদা নেই। মুমিন মুসলমানেরা সবাই ভাই ভাই। এতে আরবীদের সাথে অনআরবীদের বিয়ে-সাদীর সম্পর্ক গড়তে লাগলো। তখন অনআরবীরা আরবী মেয়েদের বিয়ে করার উদ্দেশ্য নিয়ে মদীনায় হিজরত করে আসা শুরু করে দিলো। তখন মহানবী (সাঃ) খোৎবায় বসা অবস্থায় উক্ত নিয়তের হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! আপনাদের সামনে দারসের জন্য পঠিত হাদীসটির অর্থ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য দেবার পর এখন প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করছি। হাদীসটি কওলী বা কথাসূচক হাদীস। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হতে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ - وَاِنَّمَا لِامْرِاٍمَانَوٰى

"সকল কাজের ফলাফল নিয়াতের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি কেবলমাত্র তার নিয়াত অনুসারেই আপন কাজের ফলের অধিকারী হয়।" অর্থাৎ ইবাদত সম্পর্কীয় সকল কাজ আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে ব্যক্তির নিয়াতের সততা ও পরিচ্ছন্নতার উপরে।

নিয়াত কি ? নিয়াত অর্থ– اَلْقَصْدُ وَالْاِرَادَةُ

"মনের ইচ্ছা এবং অন্তরের সংকল্প"। মনের ইচ্ছা ও অন্তরের সংকল্প প্রকাশের জন্য শাব্দিক উচ্চারণ ইসলামী পন্ডিত, মুহাদ্দীস এবং ফকীহ্‌গণের কাছে কোন যুক্তিকতা নেই বলে তারা মত প্রকাশ করেছেন। এজন্য নামাযে যে শাব্দিক উচ্চারণ দ্বারা নিয়াত করা হয় তা ইসলামী শরীয়ত দ্বারা সমর্থিত নয়। এটা কিছু আলেমদের নতুন বানোয়াট কথা। কোন হাদীস এমন কি ফিকাহ্‌র কিতাবেও এ শব্দগুলো পাওয়া যায় না।

নিয়াত এবং আ'মল উভয় শরীয়ত সম্মত হতে হবে ঃ

আল্লাহ্ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য হবার জন্য যেমন নিয়াতের বিশুদ্ধতা এবং স্বচ্ছতা থাকতে হবে, তেমনি মৌখিক দাবী ও আ'মল বা কাজটিও কুরআন-সুন্নাহ্ অনুযায়ী হতে হবে। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহাবী এবং রাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর উক্তিটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তিনি বলেন ঃ

لَا يَنْفَعُ قَوْلٌ اِلَّا بِعَمَلٍ ، وَلَا يَنْفَعُ قَوْلٌ وَلَا عَمَلٌ اِلَّا بِنِيَّةٍ ، وَلَا يَنْفَعُ قَوْلٌ وَلَا عَمَلٌ وَلَا نِيَّةٍ اِلَّا بِمَا وَافَقَ السُّنَّةَ-

অর্থাৎ "কর্ম ছাড়া মৌখিক দাবী বিফল। আর মৌখিক দাবী ও কর্ম উভয়ই বিনা নিয়াতে কার্যকরী নহে এবং মৌখিক দাবী, কর্ম ও নিয়াত

আদৌ ফলপ্রসূ হবেনা যতক্ষণ তা সুন্নত (তথা কুরআন-হাদীস) অনুযায়ী না হয়"। (জামে'উল উলুম আল হাকেম)।

সুতরাং অন্তরের নিয়াত এবং মৌখিক দাবী ও আ'মল বা কার্যক্রম সবই কুরআন এবং রাসূল (সাঃ) এর তরিকা অনুযায়ী হতে হবে। নিয়াত খুব ভালো আল্লাহ্কে খুশী করার জন্য। কিন্তু আমলের পদ্ধতি কুরআন এবং সুন্নাহ্ বিরোধী, তাহলে তাতে যেমন আল্লাহ্ খুশী হতে পারেন না। তেমনি মৌখিক দাবী এবং আ'মল বা কাজ কুরআন-সুন্নাহ্ অনুযায়ী কিন্তু নিয়াত দুনিয়ার কোন খেয়ালখুশি বা স্বার্থের জন্য হয়, তাতেও আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

নিয়াত অনুযায়ী কাজের ফলাফল লাভ করবে ঃ

হাদীসের পরবর্তী অংশে মহানবী (সাঃ) নিয়াতের সংগে সাংঘর্ষিক বাস্তব আমলের একটি উদাহরণ উল্লেখ করে বলেন ঃ

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ -

অতঃপর কেউ যদি হিজরত করে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যে, তাহলে তার হিজরত আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের জন্যেই হবে। আর যার হিজরত দুনিয়ার কোনো সুবিধার জন্য অথবা কোনো নারীকে বিয়ে করার বাসনায় হবে, তাহলে তার হিজরত সে দিকেই হবে যে নিয়াতে সে হিজরত করেছে।"

মহানবী (সাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর রাসূলের সাথে হিজরতকারী মেয়েকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হিজরত করার কথা জানার পর অথবা আরবী মেয়েদের বিয়ে করার উদ্দেশ্যে অনআরবীদের হিজরত

করার কারণ জানার পর রাসূল (সাঃ) খুৎবায় বসে এই হাদীসটি সমবেত মুমিন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। কিন্তু এর মাধ্যমে প্রকৃত মুমিন হবার জন্য এবং যে কোন ভাল কাজ আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হবার জন্য নিয়াতের গুরুত্ব অত্যধিক। যেমন যদি কেউ ইলম বা জ্ঞান অর্জন করে এবং আলেম হয়, ইসলামী আন্দোলন করে এবং তাতে শহীদও হয়। সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করে, দান-সাদকা করে, নামাজ পড়ে, হজ্ব করে এবং যাকাত দেয়। আর তার এসব আ'মলের পেছনে যদি নিছক আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়াত না হয়ে লোক 'দেখানো অথবা নিজেকে দুনিয়ায় জাহিরের জন্য অথবা কোন সুযোগ-সবিধার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তা হলে তার এই ভালো ভালো আ'মলগুলো আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য তো হবেই না বরং নিয়াতের সততার অভাবে তাকে আখেরাতে-আদালতে অত্যন্ত লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে যেতে হবে। এ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) এর একটি হাদীস বিশিষ্টরাবী এবং সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে, যে (ইসলামী আন্দোলন করতে যেয়ে) শহীদ হয়েছে। তাকে আল্লাহ্র সামনে হাজির করে তার প্রতি আল্লাহ্র দেয়া সকল প্রকার নেয়া'মতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে এসব নেয়া'মত পাবার ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি আমার এসব নেয়া'মত পেয়ে কি কি আ'মল করেছো ? সে উত্তরে বলবে ঃ (হে আল্লাহ) আমি আপনার দ্বীনের পথে লড়াই করতে করতে শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গিয়েছি। এতে আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি তো এজন্যই লড়াই (ইসলামী আন্দোলন) করেছো যে, তোমাকে লোকেরা বীর বা যোদ্ধা বলবে। সুতরাং তোমার সেই বীরত্বের সুনাম-সুখ্যাতি দুনিয়াতেই পেয়ে গেছো, (এখন আমার কাছে তোমার আর কোন পাওনা নেই।) অতঃপর তাকে উপুড় করে পা ধরে টেনে-হেচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ দেয়া হবে এবং এভাবেই সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। এরপর আল্লাহ্র দরবারে এমন এক ব্যক্তিকে হাজির

করা হবে, যে দ্বিনী ইলম শিক্ষা করেছে ও অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং আল-কুরআন পড়েছে। তাকে তার প্রতি আল্লাহ্র দেয়া সব নেয়া'মতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে লোক এসব নেয়া'মত পাবার এবং ভোগের কথা স্বীকার করবে। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, এসব নেয়া'মত পেয়ে তুমি কি কি আ'মল করেছো ? উত্তরে সে বলবে ঃ (হে আল্লাহ্!) আমি দ্বিনী ইলম শিক্ষা করেছি এবং অন্যকে তা শিক্ষা দিয়েছি। আর আপনার রাজি-খুশির জন্য আল-কুরআন পড়েছি। আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি তো নিজেকে আলেম হিসেবে খ্যাতি লাভের জন্যে ইলম বা জ্ঞান অর্জন করেছো। আর তুমি তো কুরআন এজন্যই পড়েছো যে, লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলবে। তুমি তো সেই সব সুনাম-সুখ্যাতি দুনিয়াতেই পেয়ে গেছো। (আমার কাছে তোমার কোন কিছু পাওনা নেই।) তারপর তাকে উপুড় করে পা ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে এবং এভাবেই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর এমন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্র সামনে আনা হবে, যাকে আল্লাহ্ স্বচ্ছলতা ও নানা রকম ধন-সম্পদ দান করেছেন। তাকেও তার প্রতি আল্লাহ্র দেয়া নেয়া'মতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে এসব নেয়া'মত পাবার এবং ভোগ-ব্যবহার করার কথা স্বীকার করবে। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে এসব নেয়া'মত পেয়ে তুমি কি কি আ'মল করেছো ? উত্তরে সে বলবে ঃ আমি আপনার পছন্দনীয় সব খাতেই আমার ধন-সম্পদ ব্যয়-ব্যবহার এবং খরচ করেছি। আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি তো মিথ্যা বলছো। তুমি তো 'দানবীর' হিসেবে সুনাম-সুখ্যাতি লাভের জন্যই দান-খয়রাত করেছো। সে সব সুনাম-সুখ্যাতি তো তুমি দুনিয়াতেই অর্জন করেছো। (এখন আমার কাছে তোমার কোনো কিছু পাওনা নেই।) তাকে একইভাবে উপুড় করে পা ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে এবং সেভাবেই তাকে হাজান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

(মুসলিম শরীফ)।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এ হাদীস থেকে তো এটাই প্রমাণিত হলো যে, আ'মলের কোনো ত্রুটি নেই। কিন্তু নিয়াতের মধ্যে দুনিয়ার খেয়াল এবং সততার অভাব থাকার কারণেই অত্যন্ত অপমানজনক ভাবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে।

কিয়ামতের দিন বিচার করা হবে আ'মল এবং নিয়াতের ভিত্তিতে ঃ

মানুষের মৃত্যুর পর যখন বিচারের দিন হাশরের ময়দানে বিচার করা হবে, তখন আল্লাহ্ পাক বান্দার দৈহিক রূপ সৌন্দর্যের এবং ধন-সম্পদ, বাড়ি-গাড়ী, ঐশ্বর্য্যের প্রতি দৃষ্টি বা গুরুত্ব দেবেননা। বরং তিনি সেই দিন গুরুত্ব দেবেন কেবলমাত্র বান্দার সত আ'মল এবং বিশুদ্ধ নিয়াতের প্রতি। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট রাবী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) মহানবী (সাঃ)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ إِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা (বিচারের দিন) তোমাদের চেহারার রূপ-সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের দিকে লক্ষ্য করবেন না বা গুরুত্ব দেবেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তরের নিয়াত এবং আ'মল বা কার্যক্রমের প্রতি গুরুত্ব দেবেন।" (মুসলীম শরীফ)

লোক দেখানো নিয়তে ভালো কাজও শিরক ঃ যে সব ব্যক্তি লোক দেখানোর নিয়াতে ভালো ভালো কাজ করে তারা শিরিক করে বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

عَنْ شَدَّادِبْنِ اَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ

"শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়লো সে শিরক করলো এবং যে লোক দেখানোর নিয়াতে রোযা রাখলো সে শিরক করলো এবং যে লোক দেখানোর জন্যে দান-খয়রাত করলো সেও শিরক করলো। (মুসনাদে আহমদ)

সুতরাং যে শিরক করে আল্লাহ্ পাক তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়ে জাহান্নাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাছাড়া সূরা মাউন এ-যারা লোক দেখানো কাজ করে তাদের জন্য ধ্বংস বলে উল্লেখ করে আল্লাহ্পাক বলেনঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ۝

"ঐসব নামাযীদের জন্য ধ্বংস, যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে বে-খেয়াল। আর যারা লোক দেখানো কাজ করে।" (সূরা মা'উন)

মানুষকে যাঁচাই করার পদ্ধতি ঃ কোনো মানুষকে বিশ্বাস এবং অনুসরণ করতে হবে তার বাহ্যিক সৎ আমলের ভিত্তিতে। কেননা, অন্তরের নিয়াতের বিষয়টা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও পক্ষে যাঁচাই করা সম্ভব নয়। কারণ, অন্তরের খবর কেবলমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন। এর মূলনীতি সম্পর্কে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ

"হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উকবা ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) কে বলতে শুনেছি; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সময়ে লোকদের যাঁচাই করা হতো ওহীর দ্বারা। কিন্তু এখন ওহী বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমরা তোমাদেরকে তোমাদের বাহ্যিক কাজ দ্বারা যাঁচাই করবো। অতএব, কেউ আমাদের সামনে ভাল কাজ করলে আমরা

তাকে বিশ্বাস করবো এবং আমাদের নিকটবর্তী বলে মনে করবো। আর তার অন্তরের (নিয়তের) অবস্থা অনুযায়ী বিচারের জন্য তো আল্লাহ্ই রয়েছেন। আর কেউ আমাদের সামনে খারাপ কাজ করলে আমরা তাকে মানবো না এবং তাকে বিশ্বাসও করবো না। সে যতই বলুক তাঁর অন্তরের নিয়াত খুবই ভালো (অর্থাৎ সে খুবই ভালো মানুষ।) (বুখারী শরীফ)

হাদীসের শিক্ষা ঃ

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে নিয়াত সংক্রান্ত হাদীসটির যে সব প্রয়োজনী তথ্য এবং ব্যাখ্যা-পেশ করলাম তা থেকে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, তা হলো ঃ

- প্রতিটি আ'মল বা কাজ করতে হবে একমাত্র আল্লাহ্কে রাজি-খুশি করার জন্য। দুনিয়ার কোন খেয়াল-খুশী বা সামান্যতম স্বার্থ থাকবে না।

- প্রতিটি ভালো কাজের পেছনে যেমন নিয়াতের পরিচ্ছন্নতা থাকতে হবে। তেমনি মৌখিক স্বীকৃতি এবং আ'মল বা কাজ কুরআন-সুন্নাহ্ অনুযায়ী হতে হবে। রাসূল (সাঃ) যা করেছেন তা করতে হবে এবং তিনি যা করেননি তা বর্জন করতে হবে। তা দেখতে যতই সুন্দর এবং দ্বীনি কাজ মনে হোক না কেনো। কেননা, শরীয়তের দৃষ্টিতে একে বিদআত বলা হয়েছে।

- ভালো কাজ করার পর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে গল্প করে বেড়ানো যাবে না। কেননা এতে রিয়া প্রকাশিত হয়ে যায়।

- ইলম অর্জন করা, কুরআন হেফজ করা, কুরআনকে সহীহ্ভাবে পড়া, ভালো ওয়াজ বা বক্তৃতা করা, ইসলামী আন্দোলন করা, আহত হওয়া,

প্রয়োজনে দেশ ত্যাগ করা, এমনকি শহীদ হয়ে যাওয়া। নামাজ, রোজা, হজ্, যাকাত, দান-খয়রাত ইত্যাদির ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক থাকতে হবে, যাতে করে এর মধ্যে দুনিয়ার সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন এবং সামান্যতম ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের জন্য না হয়। এজন্য মাঝে মাঝে আত্ম সমালোচনার মাধ্যমে খেয়াল করতে হবে যে, আমার এসব ভালো আ'মলের পেছনে দুনিয়ার কোন খেয়াল এসে যাচ্ছে কি না ? যদি এসে যায়, তাহলে এস্তেগফার করতে হবে।

● শয়তান সব সময় চেষ্টা করে বান্দাহ্র গোপন ভালো আম'লগুলো মানুষের সামনে প্রকাশ করার। এ ধরনের কাজ যখনই খেয়াল হবে তখনই 'তা'উউয' অর্থাৎ আউযুবিল্লাহি মিনাশ্শায়তনীর রযীম' পড়তে হবে।

আহবানঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে নিয়াত সংক্রান্ত অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ সহীহ্ হাদীসটির ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করলাম। এতে যদি কোন ভুল-ক্রটি হয়ে যায়, তার জন্য মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এ হাদীস থেকে যেসব শিক্ষা আমরা লাভ করলাম, তা যেন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে একমাত্র আল্লাহ্কেই সন্তুষ্ট করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে দারসে হাদীস শেষ করছি। "অ'আখেরু দাওয়ানা আনীল হাম্দুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন"। (সব শেষে সালাম দিয়ে দারস শেষ করতে হবে।)

দুই

দায়-দায়িত্বের জবাবদিহীতা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ- فَالْاِمَامُ الَّذِىْ عَلٰى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ .وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ -وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ - وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ -اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ (مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ)।

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং একজন রাষ্ট্রনায়ক যিনি তার অধিনস্থ নাগরিকদের দায়িত্বশীল। তিনি তার সেই অধিনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। আর প্রত্যেক পুরুষ

ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের দায়িত্বশীল এবং তাকে তার সেইসব অধিনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রত্যেক স্ত্রীলোক তার স্বামীর পরিবারের লোকদের ও তার সন্তানদের দায়িত্বশীলা এবং তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এমনকি কোনো লোকের বাড়ির চাকর সে তার বাড়ির মালিকের সম্পদের হেফাজতের দায়িত্বশীল এবং সে সেই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই (কোন না কোন ক্ষেত্রে) দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। (বুখারী মুসলিম)

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ اَلَا -সাবধান। رَاعٍ– দায়িত্বশীল, রক্ষক। وَ – এবং। مَسْئُوْلٌ– জিজ্ঞাসিত হবে। عَنْ – সম্পর্কে, হইতে। رَعِيَّتِ–অধীনস্থ। ه – তার। فَ - অতএব। اَلْاِمَامُ- রাষ্ট্রনায়ক। اَلَّذِىْ -যিনি। عَلٰى– উপর। اَلنَّاسُ – মানুষ, নাগরিক। هُوَ-তিনি, সে। اَلرَّجُلُ-পুরুষ। عَلٰى- উপর। اَهْلِ بَيْتِ -পরিবারপরিজন। لامراه– স্ত্রীলোক। رَاعِيَةٌ- দায়িত্বশীলা (স্ত্রী লিঃ)। زَوْجِ–স্বামী। هَا –তার। وَلَدِ -সন্তান। هِىَ-সে। مَسْئُوْلَةٌ – জিজ্ঞাসিত হবে (স্ত্রী লিঃ)। هُمْ- তাদের। عَبْدُ –চাকর। اَلرَّجُلُ– ব্যক্তি। مَالِ – সম্পদ। سَيِّدِ- মনিব, মালিক ه– তার। هٗ– উহা, তা।

সম্বোধনঃ সম্মানিত/ প্রিয় দ্বীনদার/ ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহি অয়াবারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে আখেরাতে-আদালতে মানুষের দায়-দায়িত্বের জবাব-দিহিতা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস পাঠ এবং অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে

হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা তুলে ধরার তাওফীক দান করেন। "অমাতাওফীকি ইল্লাহ্ বিল্লাহ্"।

হাদীসটি বর্ণনার সময়কাল ঃ আল-কুরআনের সূরা বা আয়াত নাযিলের সময়কাল যেভাবে বিভিন্ন বর্ণনা বা শানে নুযূলের মাধ্যমে সহজে জানা যায়, সেভাবে হাদীস বর্ণনার সময়কাল জানা যায় না। তবে হাদীসটির বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর মাদানী জীবনে হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন। কেননা, হাদীসে রাষ্ট্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন দায়-দায়িত্বের কথা বর্ণনা রয়েছে। যা তিনি মাদানী জীবনে লাভ করেছিলেন। সুতরাং এর ভিত্তিতে ধরে নেয়া যায় যে, হাদীসটি মাদানী জীবনের। তবে আল্লাহ্ পাকই বেশী জানেন।

রাবী বা বর্ণনাকারীর পরিচয় ঃ হাদীসটির বর্ণনাকারীর নাম আবদুল্লাহ্। কুনিয়াত আবু আবদির রহমান। পিতা-দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব। মাতা- যয়নাব। জন্ম সম্ভবতঃ নবুয়তের দ্বিতীয় বছর, ৬১২ খৃষ্টাব্দে। মৃত্যু সন ৭৪ হিজরী। ৮৩/৮৪ বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর হাদীস বর্ণনার সংখ্যা ১৬৩০ টি।

হাদীসটির পরিচয় ঃ হাদীসটি কাউলি অর্থাৎ কথা বা বর্ণনা সূচক। হাদীসটি বিশুদ্ধ এবং মারফু' হাদীস। যা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সরাসরি বর্ণনা করেছেন। বর্ণিত হাদীসটি আহমদ মুসতাদরাক কিতাবে এ ভাবেই এসেছে। তবে বুখারী এবং মুসলিম শরীফে শব্দগত কিছু কম বেশী করে হাদীসটি উভয় কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এর ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, হাদীসটি সহীহ্ বিশুদ্ধ।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে হাদীসের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করলাম। এখন নিম্নে হাদীসের মূল অংশের ব্যাখ্যা পেশ করছি। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"সমাধান তোমরা প্রত্যেকেই (কোন না কোন বিষয়ে) দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে (কেয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে।"

হাদীসের এই বাক্যে أَلاَ– শব্দ দিয়ে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে সকল মানুষকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিসয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আর كُلُّكُمْ– শব্দ দিয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে। তবে এখানে ঈমানদার মানুষ বুঝানো হয়েছে। কেননা বেঈমান কোন কাফেরকে ঈমান না থাকার কারণে দায়-দায়িত্বের জবাবদেহী করার সুযোগই দেয়া হবে না। বরং তারা বিনা হিসাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

رَاعٍ -অর্থ রাখাল বা সংরক্ষক বা দায়িত্বশীল। রাখালের দায়িত্ব যেমন তার অধিনস্থ পশুর খাওয়া-দাওয়া এবং লালন-পালনের ব্যবস্থা করা। মাঠে নিয়ে যাওয়া। মাঠ থেকে ঘরে নিয়ে আসা। মাঠে অন্যের ক্ষেতের ফসল বা বাগান যাতে ক্ষতি করতে না পারে সেইদিকে সতর্ক খেয়াল রাখা। তাছাড়া তার এসবের দায়-দায়িত্বের জবাবদিহি আবার তার মালিকের কাছে করতে হয়। অনুরূপ ভাবে একজন দায়িত্বশীলের তার অধিনস্থদের ব্যাপারে রাখালের দায়িত্ব পালন করতে হয়। এবং মহান আল্লাহ্‌র কাছে সেই দায়িত্বের জবাবদিহীতাও করতে হয়।

رَاعٍ শব্দ ব্যবহারের তাত্বিক দিক হলো– রাখালের কাজ যেমন রাখালি করা এবং তার এই রাখালি সম্পর্কে তার মালিকের কাছে জবাবদিহি করা। তেমনি ভাবে মানুষের প্রতি মানুষের দায়-দায়িত্ব এটা কোন নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব নয় বরং এটা এক প্রকার রাখালি এবং তার এই রাখালি সম্পর্কে তার মহান মালিক আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে, তার মধ্যে এই মানসিকতা সৃষ্টি করার জন্য رَاعٍ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

হাদীসে كُلُّكُمْ অর্থাৎ 'প্রত্যেকেই' শব্দ ব্যবহার করে পরবর্তীতে পরপর চারটি দায়িত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যার মধ্যে সমাজের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন উভয় দায়িত্বের কথা উল্লেখ রয়েছে এবং পরিবারের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দায়িত্বের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে।

فَالْاِمَامُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ -

"অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রনায়ক যিনি তার অধিনস্থ নাগরিকদের দায়িত্বশীল। তিনি তার অধিনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন।"

اِمَامٌ বলতে রাষ্ট্রীয় প্রধানকে বুঝানো হয়েছে। ইসলামী পরিভাষায় রাষ্ট্র প্রধানকে ঈমাম বলা হয়। কিন্তু বর্তমান সমাজে আমরা ঈমাম বলতে বুঝি কেবলমাত্র মসজিদের ঈমামদেরকে। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় প্রধান এবং শাসকগণই হবেন সংশ্লিষ্ট মসজিদের ঈমাম। ঈমাম মানেই হলো নেতা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য বর্তমান সমাজে ঈমাম হলো মসজিদ কমিটির অধিনস্থ একজন চাকুরীজীবি। কেউ কেউ তাকে কর্মচারীও মনে করে থাকে।

رَعِيَّةٌ অর্থ অধিনস্থ। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ পাক কারও প্রতি জুলুম করেন না। তিনি কেবল তাদের বিষয়ে বিজ্ঞাসাবাদ করবেন যারা তাদের অধিনস্থ। কোন মানুষের ক্যাপাসিটির বাইরের কোন দায়িত্বের কথা জিজ্ঞাসা করে তার প্রতি জুলুম করবেন না।

রাষ্ট্রীয় প্রধান বা রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ঃ হাদীসের এই বাক্যে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখন একজন রাষ্ট্রপতির তার অধিনস্থ নাগরিকদের প্রতি কি দায়িত্ব রয়েছে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই দায়িত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ পাক তার কালামে হাকীমে মৌলিক চারটি

দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

"যখন তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়ার রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করবে, তখন সে নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং (নাগরিকদের) ভাল কাজে আদেশ দেবে এবং মন্দ-খারাপ কাজ হতে বাধা সৃষ্টি করবে।"

এই আয়াতে রাষ্ট্র প্রধানের চারটি মৌলিক কাজের কথা বলা হয়েছে, যাতে তার অধিনস্থ নাগরিকদের দুনিয়া এবং আখেরাতে কল্যাণের কথাই বলা হয়েছে। আর তাহলো ঃ

১। **নামায প্রতিষ্ঠা করা ঃ** অর্থাৎ নামায ভিত্তিক সমাজ কায়েমের মাধ্যমে সকল নাগরিকদের চরিত্র সংশোধন করা। কেননা, নামাযের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ-

"নিশ্চয় নামায (নামাজিকে) সকল প্রকার অশ্লীল ও অন্যায় গুনাহর কাজ থেকে দূরে রাখে।" অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান তার অধিনস্থ নাগরিকদের মধ্যে মুসলমান নারী-পুরুষ সকলকে বাধ্যতামূলকভাবে নামায পড়ার ব্যবস্থা করে গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে সংশোধন করবে। এটা হলো রাষ্ট্র প্রধানের প্রথম কাজ। এ ব্যাপারে তাকে আখেরাতে এই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হবে।

২। **যাকাত আদায় করা ঃ** অর্থাৎ রাষ্ট্র নায়ক যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা বা অধিকার পূরণের মাধ্যমে

মানবতার কল্যাণ করবে।

মানুষের যে পাঁচটি মৌলিক চাহিদা বা অধিকার আছে তা পূরণ করা যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব।

প্রথম চাহিদা বা অধিকার ঃ মৌলিক চাহিদার মধ্যে প্রথম অধিকার ভাতের বা খাদ্য-খাবারের অধিকার। এ অধিকার ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য। আর এ অধিকার পূরণ হতে পারে যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার মাধ্যমে।

দ্বিতীয় চাহিদা বা অধিকার ঃ পোষাক-পরিচ্ছদের অধিকার। অর্থাৎ প্রতিটি নাগরিকের ইজ্জত আবরু ঢাকার অধিকার আছে। এটা রাষ্ট্রীয় ভাবেই পূরণ করতে হবে। সুতরাং যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় এ অধিকার বা চাহিদা পূরণ করতে পারে।

তৃতীয় চাহিদা বা অধিকার ঃ বাসস্থানের অধিকার। একজন মানুষ রোদের তাপ এবং বৃষ্টির পানিতে ভেজা থেকে বাঁচার অধিকার রাখে। তাছাড়া সারা দিনের ক্লান্তির পর রাতের ঘুমের দ্বারা ক্লান্তি এবং চিন্তা দূর করে নতুন উদ্দ্যমে শক্তি সঞ্চায়ের মাধ্যমে কর্মক্ষম হওয়ার অধিকারও রাখে। আর এ অধিকার যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় পূরণ করতে পারে।

চতুর্থ চাহিদা বা অধিকার ঃ চিকিৎসা বা সেবা পাবার অধিকার। একজন অসহায় নাগরিক যখন রোগাক্রান্ত হয় তখন সে মানুষ হিসেবে রোগ থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং সেবা পাবার অধিকার রাখে। আর এ অধিকারও যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার মাধ্যমে আদায় করা সম্ভব।

পঞ্চম চাহিদা বা অধিকার ঃ শিক্ষার অধিকার। একজন নাগরিকের অধিকার হলো নূন্যতম মৌলিক শিক্ষার অধিকার। শিক্ষা হলো জাতির মেরুদন্ড। যে জাতি যতো শিক্ষার দিক থেকে শিক্ষিত সে জাতি ততো

উন্নত। জ্ঞান অর্জন করার গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে।

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ (وَفِىْ رِوَايَةٍ) مُسْلِمَةٍ -

"প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ (অন্য বর্ণনায় আছে) নারীর উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয।" অর্থাৎ প্রত্যেক পুরুষ-নারীকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা অর্জন করা ফরয। এই সুযোগ করে দেবার দায়িত্ব হলো সরকারের। আর যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার মাধ্যমে অভাবী মানুষের এই সুযোগ বা চাহিদা পূরণ করা সম্ভব।

৩। সৎ কাজে আদেশ ঃ আয়াতে একজন রাষ্ট্রনায়কের তৃতীয় যে দায়িত্ব তা হলো সমাজে ভালো কাজের পরিবেশ তৈরী করে– নেক, সৎ এবং ভালো ভালো কাজ করার আদেশ দেয়া।

৪। অসৎ কাজে নিষেধ ঃ কোরআনে বর্ণিত একজন রাষ্ট্র নায়কের চতুর্থ যে দায়িত্ব তা হলো অন্যায় ও পাপ কাজের পথ বন্ধ করে দেয়া এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বাধা সৃষ্টি করা।

সুতরাং একজন রাষ্ট্র নায়ককে তার অধিনস্থ লোকদের তথা নাগরিকদের এসবের দায়-দায়িত্বের জবাবদিহীতা আখেরাতে-আদালতে হাশরের ময়দানে তার মনিব মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে করতে হবে। তাছাড়া নিজের ব্যক্তিগত জীবনের হেসাব-নেকাশ তো দিতেই হবে।

সুতরাং হাদীসে বর্ণিত রাষ্ট্র নায়কের দায়-দায়িত্বের জবাবদিহীতা এবং কুরআনে বর্ণিত তার দায়-দায়িত্বের কথা, যা বর্ণনা করা হলো– তা যদি আজকের দিনের রাষ্ট্র নায়কেরা একটু অনুভব করতো, তা হলে কি ক্ষমতার লড়াই এতো হতো ? ক্ষমতাসীন হওয়ার পর কি জনগণের মৌলিক চাহিদা এভাবে উপেক্ষিত হতো ? সাধারণ ক্ষুধার্ত নাগরিক কি আজ না খেয়ে ধুকে ধুকে মরতো এবং ডাষ্টবিনের উচ্ছিষ্ট খাবার নিয়ে

কুকুরের সাথে টানাটানি করতো ? এক টুকরো কাপড়ের অভাবে কি বণি আদম এভাবে বেইজ্জত হতো ? গরীব অসহায় ব্যক্তিরা কি চিকিৎসার অভাবে ধুকে ধুকে মরতো ? মাথা গোজার ঠাঁই এর অভাবে কি আজকে ফুটপাতে, রেলস্টেশনে এবং টার্মিনালে উদ্বাস্তবের মতো দিন যাপন করতো ? সরকার কি এতো যালেম এবং সৈরাচার হয়ে যেতো ? আজ মানুষ উদাসীন দুর্বৃত্ত। কিন্তু জেনে রাখ রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ্‌র দরবারে একদিন তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জবাবদিহি করতেই হবে। সেখান থেকে কেউ রেহায় পাবে না। কোন কিছুই তাকে সেই জবাবদিহীতা থেকে রক্ষা করতে পারবে না। হাদীসের পরবর্তী অংশে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ

“আর প্রত্যেক পুরুষ ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের দায়িত্বশীল এবং তাকে তার সেই সব অধিনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।”

এখানে পরিবারের কর্তা ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। একটি পরিবারে থাকে স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, চাকর-চাকরানী এবং অন্যান্য লোকজন। বাড়ীর মালিক তার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে সহ পরিবারের অধিনস্থ প্রত্যেকের ভালো-মন্দ কাজ কামের জন্য যেমন দায়ী থাকবে। তেমনি ভাবে তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণও তার দায়িত্ব রয়েছে। বাড়ীর কর্তা ব্যক্তিকে তার অধিনস্থদের প্রয়োজনীয় খাবার-দাবার সহ অন্যান্য যাবতীয় খরচ খরচা যেমন যোগান দিতে হবে, তেমনি ভাবে তাদেরকে দ্বীনি জ্ঞান শিক্ষা দেবার মাধ্যমে ইসলামী শরা-শরীয়তের উপরও চালাতে হবে। নাগায়ের বয়স হলে তাদেরকে নামাজি বানাতে হবে। আদর্শবান করে গড়ে তুলতে হবে। স্ত্রীকে পর্দায় রাখতে হবে এবং তার যাবতীয় দ্বীনি এবং বৈষয়িক হক আদায় করতে হবে। বাড়ীতে যদি চাকর-চাকরানী থাকে তাদের সাথে

ভালো আচরণ করতে হবে। নিজে যা খাবে এবং পরবে তাকেও তা খাওয়াবে এবং পরাবে। বাড়ীতে যদি বৃদ্ধ পিতা-মাতা থাকে তাহলে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার সহ তাদের যা হক আছে তা আদায় করতে হবে। ছোট ছোট ভাই-বোনদের সাথে পিতার ভূমিকা রাখতে হবে। মোট কথা বাড়ীর সকলের দুনিয়া এবং আখেরাতের জীবনকে কল্যাণকর করার জন্য যার যা পাওনা বা চাহিদা তাদের তা পূরণ করতে হবে। হাদীসে একজন গৃহকর্তার এসব দায়-দায়িত্বের জবাবদিহীতার কথায়ই বলা হয়েছে। হাদীসে পরিবারের পরবর্তী দায়িশীলের দায়-দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

وَالْاِمْرَاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ -

"আর প্রত্যেক স্ত্রী লোক তার স্বামীর পরিবারের লোকজনের ও তার সন্তানদের দায়িত্বশীলা এবং তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

অত্র হাদীস হতে জানা যায় যে, প্রত্যেক স্ত্রীলোক হলো তার স্বামীর সংসারের দায়িত্বশীলা। পরকালে তাকেও সে দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। একটি পরিবারের কাজ দু'ভাগে বিভক্ত। বাড়ীর বাইরের কাজ এবং ভিতরের কাজ। স্বামীকে বাইরের কাজ পুরোপুরি এবং ভিতরের কাজেও সহযোগীতা এবং তদারকী করতে হয়। কিন্তু স্ত্রীকে বাড়ীর ভিতরের কাজের পুরোপুরি দায়িত্ব পালন করতে হয়। স্ত্রী তার স্বামীর পরিবারের ধন-সম্পদের হেফাজত করবে, অপচয় করবে না, ছেলে-মেয়েদেরকে আদর-স্নেহ, সুশিক্ষা এবং চরিত্র মাধুর্য দিয়ে আদর্শবান করে গড়ে তুলবে। পরিবারের আর যারা সদস্য আছে তাদের যার যে হক তা আদায় করবে। স্বামীর সংসার এবং পরিবার পরিচালনায় পুরোপুরি সহযোগীতা করবে।

সুতরাং ইসলামী শরীয়তে পরিবারে স্ত্রীর জন্য যতটুকু দায়িত্ব দিয়েছে সেই দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতঃপর হাদীসে সর্বশেষ ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ

"এবং কোন ব্যক্তির চাকর তার নিজ মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল এবং সে তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

সমাজের সবচেয়ে ছোট দায়িত্বশীল হলো বাড়ীর চাকর-চাকরানীরা। তাদেরও কিছু দায়-দায়িত্ব আছে। সুতরাং যত ছোট এবং ক্ষুদ্র দায়িত্বই হোক না কেন তারাও তার সেই দায়িত্ব সম্পর্কে আখেরাতে আদালতে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবে। বাড়ীতে যেসব চাকর-চাকরানী থাকে তাদের দায়িত্ব হলো, তার মালিকের যে সব সম্পদ আছে তার রক্ষণাবেক্ষণ করা। তাকে যেই কাজের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে সেই কাজ যথাযথভাবে পালন করা। কেননা শুধু মালিকের কাছেই নয় বরং আখেরাতে আদালতে তার সেই সব দায়-দায়িত্ব এবং কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ জবাবদিহি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে করতে হবে।

উপরোক্ত হাদীসের ভাষ্য হতে দেখা যায় যে,কোন মানুষই পুরুষ হোক আর নারীই হোক, কেহই দায়িত্ব মুক্ত নয়। সকলেরই কিছু না কিছু দায়িত্ব আছে। আলোচ্য হাদীসে মানুষের মধ্যে চার শ্রেনীর দায়িত্বশীলের দায়িত্ব এবং জবাবদিহীতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে নারী-পুরুষ উভয়ের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

অত্র হাদীস থেকে এটাই অনুধাবন করা যায় যে, প্রতিটি মানুষই ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে কোন না কোন দায়িত্বশীল। তাছাড়া যে ব্যক্তি যে কর্মক্ষেত্রে বা পেশায় নিয়োজিত আছে, সেটাও তার

দায়িত্ব এবং আমানত। আর সে সব দায়িত্ব এবং আমানত সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং আমাদেরকে দুনিয়ায় অত্যন্ত সজাগ সচেতন ভাবে জীবন অতিবাহিত করতে হবে এবং আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। পরিশেষে হাদীসে আবারও সাবধান বাণী উচ্চারণের মাধ্যমে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ

"সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের সকলকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে (আখেরাতে) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে মানুষের দায়-দায়িত্ব সংক্রান্ত হাদীসের যে ব্যাখ্যা পেশ করা হলো, তা থেকে যেসব শিক্ষনীয় বিষয় পাওয়া যায় তা হলো ঃ

- মানুষ নারী হোক অথবা পুরুষ হোক। যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন প্রত্যেকেই কোন না কোন পর্যায়ের দায়িত্বশীল।

- সামাজিক হোক অথবা সাংগঠনিক হোক কিংবা রাষ্ট্রীয় হোক, যার উপর যে দায়িত্ব আছে সেটা পদ মনে না করে বরং দায়িত্ব মনে করা এবং আখেরাতে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে জবাবদিহি করতে হবে সেই ভয় মনের মধ্যে সবসময় রাখা।

- কোন দায়িত্ব যেমন চেয়ে নেয়া যাবে না, তেমনিভাবে দায়িত্ব এসে গেলে এড়িয়েও যাওয়া যাবে না। কেননা হাদীসে এসেছে "যে দায়িত্ব চেয়ে নেয় আল্লাহ্ তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সহযোগীতা করেন না। আর জনগণ যাকে দায়িত্ব দেয় সেই দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাকে সহযোগীতা করে থাকেন"।

● প্রতিটি দায়িত্ব আমানত মনে করে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তাআলাকে রাজি-খুশির জন্যই পালন করা। দায়িত্ব পালন লোক দেখানো বা দুনিয়ার কোনো প্রশংসা কুড়ানোর নিয়াতে করা যাবে না।

● প্রত্যেককে তার পেশাগত দায়িত্ব নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে সঠিকভাবে পালন করতে হবে। কেননা পেশাগত দায়িত্ব হলো তার কাছে আমানত। এই আমানতের সঠিক হেফাজত করতে হবে।

● হুকুকুল্লাহ্ (আল্লাহ্র অধিকার) এবং হুকুকুল ই'বাদ (বান্দার অধিকার) উভয় দায়িত্ব সঠিকভাবে আঞ্জাম দিতে হবে।

● মানুষ হলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দুনিয়ায় নিয়োজিত খলিফা। সেইহেতু খেলাফতের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালনের জন্য আল্লাহ্র এই দুনিয়ায় দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জড়িত থাকা এবং যথাযথভাবে সেই দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া।

আহ্বান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে মানুষের দায়-দায়িত্বের জবাবদিহীতা সংক্রান্ত হাদীসের যে দারস পেশ করলাম, এতে যদি আমার কোন ভুল-ত্রুটি এবং বাড়াবাড়ি হয়ে যাই তার জন্য মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং পেশাগতভাবে যার উপর যা দায়িত্ব আছে তা যেন কেবলমাত্র আল্লাহ্কে রাজি-খুশি করার মত মন নিয়ে পালন করতে পারি, সেই তৌফিক কামনা করে দারস শেষ করছি।

তিন

ইসলামের মৌলিক ভিত্তি বা খুঁটি

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ، اَمَّا بَعْدُ
اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটিঃ [এক] এই বলে স্বাক্ষ দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর অন্য কোনো ইলাহ্ বা মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। [দুই] নামায প্রতিষ্ঠা করা। [তিন] যাকাত আদায় করা। [চার] হজ্ব করা এবং [পাঁচ] রমযান মাসে রোযা রাখা। (বুখারী এবং মুসলিম শরীফ)

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ

عَنْ–থেকে বা হতে। اِبْنٌ - ছেলে বা ব্যাটা। قَالَ - বলা, বলেন।

بُنِىَ–ভিত্তি, খুটি, পিলার। عَلٰى–উপর। خَمْسٍ–পাঁচ

شَهَادَةِ-স্বাক্ষ দেয়া। اَنْ- যে। لاَ- -না বা নাই। اِلٰهَ- মা'বুদ। اِلاَّ -ছাড়া বা ব্যতীত। وَ -এবং اَنَّ- -নিশ্চয়। عَبْدُ -দাস বা বান্দা। هُ-তার। اِقَامِ -কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করা اَلصَّلٰوةِ- নামাজ। اِيْتَاءِ -প্রদান বা আদায় করা। اَلزَّكٰوةِ -যাকাত। صَوْمِ -রোযা।

সম্বোধন ঃ উপস্থিত সম্মানিত ইসলামী আন্দোলনের কর্মী/ ইসলাম প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে 'সেহাহ্ সেত্তার'শ্রেষ্ঠ দু'টি হাদীসের কেতাব বুখারী এবং মুসলিম শরীফে উল্লেখিত ইসলামের মৌলিক ভিত্তি সংক্রান্ত হাদীসটি পাঠ এবং অনুবাদ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেনো আমাকে আপনাদের সামনে হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

হাদীসটি বর্ণনা করার সময়কাল ঃ আল কুরআন অবতরনের সময়কাল যেমন সহজে জানা যায়, হাদীসের ক্ষেত্রে তেমনটি সহজ নয়। তার পরেও হাদীসটির বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাদীসটি তার মাদানী জীবনে বর্ণনা করেছিলেন। কেননা মাদানী জীবনেই নামায পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা এবং যাকাত আদায়, হজ্ব করা এবং রমযান মাসে রোযা রাখার নির্দেশ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছিলো।

হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা ঃ অত্র হাদীসটি সহীহ বা বিশুদ্ধ। কেননা 'সেহাহ সেত্তা' কেতাবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীসের কেতাব বুখারী এবং মুসলিম শরীফে হাদীসটি স্থান পেয়েছে। আর এই হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কেউই প্রশ্ন তুলেননি। হাদীসটি কাউলী এবং মারফু' যা সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বর্ণনা করেছেন।

রাবী বা বর্ণনাকারীর পরিচয় ঃ হাদীসটির রাবী বা বর্ণনাকারী নাম-আবদুল্লাহ্। কুনিয়াত-আবু আবদির রহমান। পিতার নাম-হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)। মাতার নাম-যয়নাব। তাঁর জন্ম সম্ভবতঃ নবুয়তের ২য় বছর, ৬১২ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যুবরণ করে ৭৪ হিজরীতে। ৮৩-৮৪ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা-১৬৩০টি।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে হাদীসটি ব্যাখ্যার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় পরিচয় তুলে ধরলাম। এখন হাদীসটি ব্যাখ্যা পেশ করছি।

بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ "ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।" অত্র হাদীসে ইসলামকে একটি ঘরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মানুষ যাতে ইসলামকে সহজে বুঝতে পারে এই জন্য মানুষের জীবনের সাথে অত্যন্ত পরিচিত একটি জিনিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে। একটি ঘরের যেমন কতকগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খুঁটি বা পিলার বা স্তম্ভ থাকে, তেমনি ইসলাম নামের এই ঘরটির পাঁচটি বিশেষ খুঁটি বা পিলার রয়েছে। যা মৌলিক বা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যেমনঃ কালিমা, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত। ইসলামের অনুসারী মুসলমানকে এই পাঁচটি আহকাম অবশ্যই পালন করত হবে। তবে উল্লেখ থাকে যে, কেবলমাত্র খুঁটি বা পিলারকে যেমন ততক্ষণ পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ ঘর বলা যায় না, যতক্ষণ তার সাথে খড়, দড়ি, বাঁশ অথবা ইট, বালু, সিমেন্ট, রড, খুয়া ইত্যাদি সংযোগ না দেয়া হয়। তেমনি ভাবে কেবলমাত্র ইসলামের পাঁচটি খুঁটি বা স্তম্ভ কায়েম করলেই ইসলাম কায়েম হয়ে যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত পাঁচটি খুঁটির উপর পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করা না হয়।

অন্য একটি হাদীসে মুসলমানদের অসংখ্য ইমানের শাখা-প্রশাখার কথা

উল্লেখ করে রাসূল (সাঃ) বলেনঃ

اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ

অর্থাৎ "ইমানের সত্তরটিরও বেশী শাখা-প্রশাখা আছে। তার মধ্যে সর্ব উত্তম শাখাটি হলো- এই কথা বলা যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই এবং সবচেয়ে নিম্ন শাখাটি হলো- রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাও হলো ইমানের একটি বিশেষ শাখা।" (বুখারী মুসলিম, রাবী আবু হুরাইরা)।

অত্র হাদীসে ইমানের প্রায় ৭৭টি শাখার মধ্যে মাত্র তিনটি শাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং মানুষের জন্য প্রতিটি কল্যাণকর কাজই হলো ইসলামের অন্তর্ভুক্ত মুসলমানদের ঈমানী কাজ। আর এগুলোই হলো ইসলাম নামের পূর্ণাঙ্গ ঘরের খড়, দড়ি, বাঁশ বা ইট, বালু, সিমেন্ট, রড, খুয়া ইত্যাদি। অতঃপর রাসূল (সাঃ) হাদীসের পরবর্তী অংশে পাঁচটি খুঁটি বা স্তম্ভের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ

প্রথম খুঁটি বা স্তম্ভ ঃ

شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

"এই বলে স্বাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর অন্য কোন ইলাহ্ বা মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল"। ইসলাম নামের এই ঘরকে যদি একটি তাঁবুর সাথে তুলনা করা হয়, তা হলে আরও সুন্দর ভাবে পাঁচটি খুঁটিকে মিলানো যায়। যেমন একটি তাঁবুর পাঁচটি খুঁটির প্রয়োজন হয়। চারদিকে চারটি এবং মাঝখানে একটি মূল খুঁটি দিয়ে তাঁবুকে উঁচু করে রাখা হয়। অনুরূপভাবে ইসলাম নামের এই ঘর বা

তাঁবুর পাঁচটি খুঁটির মধ্যে কালেমা বা তাওহীদের স্বাক্ষ্য দেওয়া হলো ইসলামের মূল খুঁটি এবং নামায, যাকাত, হজ্ব ও রোযা হলো চারদিকের চারটি খুঁটি।

হাদীসের এই অংশে ইসলামে প্রবেশ করার প্রথম শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইসলামের রুহু বা আত্মা। যা বিশ্বাস না করলে অন্যগুলো অসার বলে প্রমাণিত হয়। যেমন তাঁবুর মূল খুঁটি না থাকলে অন্য খুঁটিগুলোর কার্যকারিতা অসার বলে প্রমাণিত হয়। সুতরাং প্রথমেই আল্লাহ্‌র তাওহীদ বা একত্ববাদ অন্তরে বিশ্বাসের মাধ্যমে মুখে ঘোষণা দিয়ে স্বাক্ষ্য দিতে হবে যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ বা আইনদাতা, রিযিকদাতা, পালনকর্তা, হায়াত-মযুতের মালিক আর কেউ নেই এবং তার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসর্ম্পণ করতে হবে। আর সাথে সাথে তাঁরই হাবীব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে রাসূল হিসেবে মনেপ্রাণে স্বীকার করে তাঁর আদর্শকে মেনে নিয়ে পরিপূর্ণভাবে আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে।

দ্বিতীয় খুঁটি বা স্তম্ভ ঃ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ "এবং নামায কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করা।"

ইসলাম নামের এই ঘরের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি হলো নামায কায়েম করা। ইসলামে প্রবেশ করার পর মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেবার জন্য প্রথমেই যে কাজটি করতে হয় তা হলো নামায আদায়। কেননা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে- بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ

অর্থাৎ আবেদ বা মুসলমান এবং কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো নামায"। তার মানে নামায হলো মুসলমানের 'আইডেন্টিকার্ড' বা 'পরিচয়পত্র'।

হাদীসের এই অংশে নামায পড়ার কথা বলা হয়নি বরং নামায কায়েম করার কথা বলা হয়েছে। তার কারণ, নামায হলো একটি সামাজিক

ইবাদত। এর মাধ্যমে সমাজের মানুষের জন্য অনেক অনুসরণীয় এবং শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। সমাজের নাগরিকদের সংশোধনের সুযোগ রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

"নিশ্চয় নামায সকল প্রকার অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে দূরে রাখে।" সুতরাং আমাদের দেশের মুসলমান নারী-পুরুষ (দশ বছর বয়স থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত) যখন সবাই মিলে নামায পড়বে, কেবলমাত্র তখনই নামায কায়েম হয়েছে বলা যাবে। আর এই দায়িত্বটি পালন করবেন ইসালামী সরকার। তার দায়িত্ব সম্পর্কে আল-কুরআনে মহান আল্লাহপাক উল্লেখ করে বলেনঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

"তোমাদের যখন কেউ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করবে, তখন তার কাজ হবে নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, ভাল এবং নেক কাজে আদেশ দেয়া এবং অন্যায় ও গুনাহর কাজে বাধা দেয়া"।

প্রকৃতপক্ষে একটি ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রই হবে নামায ভিত্তিক। এর দ্বারা গোটা নাগরিকদের চরিত্র সংশোধনের মাধ্যমে কূলশমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা।

তৃতীয় খুঁটি বা স্তম্ভ ঃ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ **এবং যাকাত আদায় করা।"**

ইসলাম নামের এই ঘরের তৃতীয় খুঁটি বা স্তম্ভ হলো যাকাত আদায় এর মাধ্যমে নিজের ধন-সম্পদের পবিত্রতা অর্জন করা এবং সমাজের গরীব-অসহায়দের পুনর্বাসনের মাধ্যমে মানবীয় মৌলিক চাহিদা পূরণ করা।

যাকাত আদায়ের দু'টি ফায়দা- (১) যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সাহেবে মাল বা যাকাত আদায়ে সক্ষম ব্যক্তির মাল-সম্পদ পবিত্র হয়। আর এই

পবিত্র হওয়ার জন্য ধন-সম্পদের বরকতের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া পবিত্র রুজি দ্বারা রক্ত-মাংসে গঠিত দেহে ইবাদত-বন্দেগীও আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়। (২) যাকাত আদায়ের দ্বিতীয় ফায়দা হলো, হকুকুল ইবাদত বা বান্দার হক আদায়। সমাজের বসবাসকারী মানুষের মৌলিক চাহিদা হলো– খেয়ে বাঁচা, পোষাকের দ্বারা নিজের ইজ্জত আব্রু রক্ষা করা বসবাসের ঘরের মাধ্যমে রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং আরাম করা। চিকিৎসা এবং সেবার দ্বারা রোগ-শোক থেকে উদ্ধার পাওয়া। শরীয়তের মৌলিক বিষয় জানা এবং জানার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করা। ইসলামের এই মৌলিক কাজ যাকাত আদায় এবং বন্টনের কাজটিও ইসলামী সরকারের। প্রচলিত পদ্ধতিতে যেভাবে আমরা যাকাত আদায় করে থাকি তাতে যাকাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। কেননা, যাকাত বন্টনের যে আটটি খাত কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে সেই খাতগুলো পূরণ করতে হলে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালুর জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। নামায প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে যাকাত আদায় করার কথা বলার পেছনে উদ্দেশ্য হলো–নামায ধীরস্থির এবং মনোনিবেশের সাথে আদায় করতে হলে ক্ষুধামুক্ত থাকতে হবে। পেটে ক্ষুধা নিয়ে নামায আদায় করলে নামাজে মন বসেনা। আর নামাযে মন না বসলে নামায কবুলও হয় না। হাদীস শরীফে মহানবী (সাঃ) বলেনঃ **"যদি নামাযের জামায়াত শুরু হয়ে যায় আর এদিকে খাবার সামনে এসে হাজির হয়, তবে আগে খেয়ে নাও তার পরে নামায আদায় করো।"** সুতরাং ইসলামের এই তৃতীয় খুঁটি বা স্তম্ভটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যা বিশ্লেষণ করলে বই এর কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাবে।

চতুর্থ খুঁটি বা স্তম্ভ ঃ وَالْحَجِّ এবং হজ্ব করা"। ইসলাম নামের ঘরের চতুর্থ খুঁটিটি হলো হজ্ব। এই মৌলিক ইবাদতটি সকলের জন্য

প্রযোজ্য নয়। যাদের হজ্ব করার আর্থিক সংগতি আছে এবং সুস্থ শরীর রয়েছে কেবল তাদেরকেই এই ইবাদতটি আদায় করতে হয়। এই এবাদতটিরও দু'টি ফায়দা রয়েছে। (১) বৈধ সম্পদ খরচের মাধ্যমে হজ্ব আদায় করে নিজেকে গোনাহ্মুক্ত করে নেয়া। (২) আর হজ্ব এর মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিম সম্মেলন ঘটিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতবিনিময়ের মাধ্যমে একে অপরের সম্পর্কে জানা এবং একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করা। যা অন্য কোন ধর্মের পক্ষে এটা আদৌ সম্ভব নয়।

পঞ্চম খুঁটি বা স্তম্ভ ঃ – وَصَوْمِ رَمَضَانَ **"এবং রমযান মাসে রোযা রাখা"**। ইসলাম নামের ঘরের পঞ্চম এবং সর্বশেষ খুঁটি বা স্তম্ভ হলো রোযা পালন করা। এটি ইসলামী সমাজের নাগরিকদের মধ্যে আধ্যাতিক এবং তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি করে। এই ইবাদাতটি নিছক আল্লাহ্ তাআলাকে রাজি-খুশি করার জন্যই করা হয়ে থাকে। কেননা হাদীসে রাসূল (সাঃ) উল্লেখ করে বলেন ঃ আল্লাহ্ পাক বলেনঃ اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ "রোযা খাস করে আমার জন্য **এবং এর প্রতিদান আমি নিজ হাতে দেব।"** কেননা অন্যান্য ইবাদতের পেছনে লোক দেখানোর সুযোগ আছে কিন্তু এই রোযার ইবাদতটিতে লোক দেখানোর কোন সুযোগ নেই। এই জন্যই উপরোক্ত হাদীসে **"আমার জন্য"** কথাটি বলা হয়েছে।

এই রোযার এবাদতটি রমযান মাসে ফরজ রোযার কথা বলা হয়েছে। রোযা এমন এক মাসে ফরজ করা হয়েছে যা অত্যন্ত বরকতপূর্ণ এবং মর্যাদাপূর্ণ। কেননা, এই মাসেই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়। আর এই মাসেই একটি বরকতপূর্ণ রাত্রি রয়েছে যার মর্যাদা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। সুতরাং ইসলামের এই সর্বশেষ মৌলিক স্তম্ভ বা খুঁটি যা মুমিন মুসলমানদের চারিত্রিক, নৈতিক এবং ইমানী বলিষ্ঠতা সৃষ্টি করে। খোদাভীত সৃষ্টির ট্রেনিং দেয়।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে ইসলামের কয়েকটি মৌলিক স্তম্ভ সংক্রান্ত হাদীসটির যে ব্যাখ্যা পেশ করলাম, তা হতে আমাদের জন্য যে সব শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে, তা হলোঃ

● আল্লাহ্ তাআলা যে একক তা নিজের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে এবং মৌখিকভাবে স্বাক্ষ্য দিতে হবে।

ফ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে ফেরেশ্তা বা অন্যকিছু মনে করা যাবে না। বরং তিনিও আল্লাহর্ একজন বান্দা এবং নবী-রাসূল বলে অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে এবং মৌখিক স্বাক্ষ্যও দিতে হবে।

● নিজে নামায আদায় করতে হবে এবং সবাই মিলে নামায আদায় করার জন্য রাষ্ট্রীয় ভাবে নামায কায়েমের উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক থাকতে হবে।

● যাকাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালুর জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

● আর্থিক এবং দৈহিক ভাবে ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অবশ্যই হজ্ব আদায় করতে হবে এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির জন্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর উদ্যোগী ভূমিকা রাখতে হবে।

● রমযান মাসে রোযা পালনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন, খোদাভীতি অর্জন এবং বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করতে হবে। তাক্ওয়া ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধন করতে হবে।

আহবান ঃ প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ বা খুঁটি সম্পর্কে আপনাদের সামনে হাদীসের যে দারস পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল-ক্রটি হয়ে যায়, তার জন্য মহান আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই হাদীস থেকে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় রয়েছে তা যেন বাস্তব জীবনে পালন করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে দারস শেষ করছি। আল্লাহ্ হাফিজ।

চার

হালাল-হারামের বাচ-বিচার এবং সন্দেহযুক্ত জিনিস পরিহার

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهٖ وَعِرْضِهٖ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ كَالرَّاعِى يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يَّرْتَعَ فِيْهِ اَلَا وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اَلَا وَاِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهٗ اَلَا وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ (مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ ঃ হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ হালাল বা বৈধ সুস্পষ্ট এবং হারাম বা অবৈধও স্পষ্ট। আর এ দু'এর মধ্যবর্তী বিষয়গুলো হলো সন্দেহজনক। আর বেশীর ভাগ লোকই সেগুলো (সম্পর্কে সঠিক পরিচয়) জানে না। অতএব যে ব্যক্তি ঐ সন্দেহজনক জিনিসগুলোকে পরিহার করলো সে তার দ্বীন ও মান-সম্মানকে পবিত্র রাখলো। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক জিনিসে জড়িয়ে পড়লো সে হারামের মধ্যে

পড়ে গেলো। যেমন কোনো রাখাল (কোনো নিষিদ্ধ) মাঠের আশেপাশে পশু চরায়, আর এতে সম্ভাবনা আছে যে, সে তাতে (নিষিদ্ধ মাঠে) তার পশু ঢুকিয়ে দেবে। সাবধান! নিশ্চয়ই প্রত্যেক বাদশাহ্‌র একটি নিষিদ্ধ মাঠ বা এরিয়া থাকে। মনে রেখ আল্লাহর নিষিদ্ধ মাঠ হলো তাঁর হারাম জিনিসগুলো। আর সাবধান! মানুষের দেহের মধ্যে এক টুকরো গোশত আছে। যখন সেই গোশ্‌তের টুকরোটি সুস্থ্ থাকে, তখন গোটা দেহ সুস্থ্ থাকে, আর যখন তা দূষিত বা খারাপ হয়ে যায় তখন গোটা দেহটাই অসুস্থ্ হয়ে পড়ে। জেনে রেখ, এটাই হলো ক্বল্‌ব বা অন্তকরণ। (বুখারী–মুসলিম)

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ

اَلْحَلَالُ-বৈধ। بَيِّنٌ – স্পষ্ট। وَ – এবং। اَلْحَرَامُ – অবৈধ। بَيْنَهُمَا উহাদের উভয়ের মাঝে। مُشْتَبِهَاتٌ – সন্দেহজনক জিনিস। لَايَعْلَمُهُنَّ – তারা জানে না। كَثِيْرٌ – বেশীর ভাগ। مِنَ النَّاسِ – মানুষের মধ্যে। فَمَنْ – অতঃপর যে। اِتَّقٰى –পরিহার করলো। لِدِيْنِهٖ- তার দ্বীনের জন্য। عِرْضِهٖ – তার মান সম্মান। مَنْ – যে। وَقَعَ – জড়িয়ে পড়া। اَلشُّبُهَاتِ –সন্দেহজনক। اَلرَّاعِيْ –রাখাল। يَرْعٰى পশু চরায়। حَوْلَ الْحِمٰى –মাঠের (চারণভূমির) আশেপাশে। يُوْشِكُ সম্ভাবনা আছে। يَرْتَعَ فِيْهِ –উহাতে তার পশু ঢুকিয়ে দেবে। اَلَا – সাবধান! اِنَّ –নিশ্চয়। لِكُلِّ مَلِكٍ – প্রত্যেক বাদশাহ্‌র জন্য। حِمًى – চারণভূমি বা মাঠ। مَحَارِمُهٗ – নিষিদ্ধ জিনিসগুলো। اَلْجَسَدِ-শরীর বা দেহ। مُضْغَةٌ – গোশতের টুকরা। اِذَا যখন। صَلُحَتْ –সুস্থ থাকে। كُلُّهٗ – উহার সবটুকু। هِيَ –উহা বা তা। اَلْقَلْبُ – অন্তকরণ।

সম্বোধন ঃ প্রিয় দ্বীনি/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের সামনে হাদীসের দারস পেশ করার জন্য রাবী নু'মান ইবনে বাশীর ঃ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি পাঠ এবং অনুবাদ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেনো আমাকে তাওফীক দেন হাদীসটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও শিক্ষা তুলে ধরার।

হাদীসটির বর্ণনার সময়কাল ঃ

আমার মনে হয় হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার মাদানী জীবনে বর্ণনা করেছেন। কেননা ইসলামী শরীয়ত সংক্রান্ত বিষয়ুগলো মদীনায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের পরই নির্ধারণ হয়। কোনটি হালাল, কোনটি হারাম এসব বিষয়গুলো মাদানী জীবনেই চূড়ান্ত হয়।

রাবী বা বর্ণনাকারীর পরিচয় ঃ

নামঃ– নু'মান। **পিতার নামঃ–** বাশীর বিন সায়াদ আনসারী (রাঃ)। তিনি বায়আতে আকাবায় অংশ নিয়েছিলেন। বশীর (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। **মাতার নামঃ** হযরত উমরাহ বিনতে রাওয়াহা। তিনি অত্যন্ত মুখলিস সাহাবিয়াহ্ ছিলেন। **জন্মঃ–** হযরত নু'মান বদর যুদ্ধের ৩/৪ মাস পূর্বে দ্বিতীয় হিজরীতে মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, নবী (সাঃ) এর হিজরাতের পর কোনো আনসারীর ঘরে নু'মানই প্রথম জন্ম গ্রহণ করেন। রাসূল (সাঃ) এর ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিলো ৮ বছর ৭ মাস। এত অল্প বয়সেই তিনি রাসূল (সাঃ) এর অসংখ্য হাদীস মুখস্ত করে নেন। **প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন ঃ** হযরত নু'মান (রাঃ) হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর শাসন আমলে কুফার গভর্নর এবং ইয়াজীদের আমলেও হেমসের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন।

মৃত্যুঃ হযরত নু'মান (রাঃ) উমাইয়া শাসন আমলে প্রায় ২০ বছর শাসক হিসাবে খেদমত করেন এবং তারই এক শাসকের হাতে ৬৫ হিজরীতে শাহাদাৎ বরণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো ৬৪ বছর।

বর্ণিত হাদীসের কেতাবের পরিচয় ঃ

হাদীসটি "মুত্তাফিকুন আলাইহ্" অর্থাৎ বুখারী মুসলিম শরীফে উভয় কেতাবে সংকলিত হয়েছে। হাদীসের ছয়টি বিশুদ্ধ কেতাবের মধ্যে বুখারী শরীফের স্থান হচ্ছে সর্বপ্রথমে আর তার পরের স্থানটি হলো মুসলিম শরীফের। সুতরাং হাদীসটি যে সহীহ্ বিশুদ্ধ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ব্যাখ্যাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে হাদীসটির প্রাথমিক ধারণা প্রদান করলাম। এখন নিম্নে হাদীসটির প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করছি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ

অর্থাৎ **"হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট।"** হাদীসের প্রথমেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন যে, শরীয়তে যেসব জিনিস হালাল করা হয়েছে তা কুরআন এবং হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে শরীয়তের হারাম জিনিসগুলোও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো গ্রহণ বা বর্জন করতে মানুষকে বেগ পেতে হয় না। কিন্তু যেসব জিনিস শরীয়তে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়নি সে সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেনঃ

وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ- لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ

"আর এ দু'য়ের (হালাল-হারামের) মধ্যবর্তী জিনিসগুলো হলো সন্দেহজনক। বেশীর ভাগ লোকজন সেগুলো (সম্পর্কে সঠিক পরিচয়) জানে না।" অর্থাৎ দুনিয়াতে অনেক জিনিস আছে যেগুলো সম্পর্কে শরীয়তে স্পষ্টভাবে হালাল না হারাম তা উল্লেখ করা হয়নি। যা বিশেষজ্ঞ আলেম ছাড়া সাধারণ লোকদের জানা সম্ভব নয়। সুতরাং সমাজের অধিকাংশ লোকেরই সেসব বিষয় সম্পর্কে (হালাল-হারাম) বাচ-বিচার করা সম্ভব নয়। অতএব এ ধরনের সন্দেহজনক জিনিস সম্পর্কে লোকদের

করণীয় কি হবে তার নীতিমালা উল্লেখ করে মহানবী (সাঃ) হাদীসের পরবর্তী অংশে বলেনঃ

فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهٖ وَعِرْضِهٖ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ

"অতএব যে ব্যক্তি এ সন্দেহজনক জিনিসগুলো পরিহার করবে সে তার "দ্বীন ও মান-সম্মানকে পবিত্র রাখবে। আর যে লোক সন্দেহজনক জিনিসে জড়িয়ে পড়বে সে হারামের মধ্যে পতিত হবে।"

হাদীসের এ অংশে সন্দেহজনক জিনিস ত্যাগ করার কথাই বলা হয়েছে। একজন পরহেজগার মুমিন মুত্তাকীন লোকের কাজই হবে যখন সে কোনো সন্দেহজনক জিনিসের সম্মুখীন হবে তখন সাথে সাথে তা পরিহার করা। কেননা এতে তার দ্বীন ইসলাম সংরক্ষিত হয় অর্থাৎ হারাম থেকে বাঁচতে পারে এবং হারাম থেকে বাঁচার কারণে তার দেহ মন পবিত্র থাকে এবং মান-সম্মানও রক্ষা পায়। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি এসব সন্দেহজনক জিনিসে জড়িয়ে পড়ে অথচ তার জানা সেই যে এটা হালাল না হারাম। সুতরাং এসব সন্দেহজনক জিনিস গ্রহণ করার কারণে হারামের মধ্যে নিপতিত হয়ে নিজের দ্বীন ইসলামকে ধ্বংস করে এবং হারাম ভক্ষণের কারণে দুনিয়া এবং আখেরাতে সে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হয়। কিন্তু আমাদের সমাজের বেশীর ভাগ লোককেই দেখা যায় কোনো সন্দেহযুক্ত অথবা বিতর্কিত জিনিসকে হালাল করার উদ্দেশ্যে ফতুয়ার জন্য ছুটাছুটি করে বেড়ায় এবং বিভিন্ন কায়দা-কানুনের মাধ্যমে তা গ্রহণ করার চেষ্টা করে। অথচ হযরত উমরে ফারুক (রাঃ)বলেনঃ **"আমরা হারামে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে হালাল জিনিসের দশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করতাম এবং নয় ভাগই বর্জন করতাম।"**

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদীসের পরবর্তী অংশে উদাহরণ পেশ করে বলেন ঃ

كَالرَّاعِىْ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يَّرْتَعَ فِيْهِ

"যেমন কোনো রাখাল (কোন নিষিদ্ধ) মাঠের আশেপাশে পশু চরায়, সম্ভাবনা আছে যে, সে তাতে (নিষিদ্ধ মাঠে) তার পশু ঢুকিয়ে দেবে।" এখানে মহানবী (সাঃ) সন্দেহজনক জিনিস থেকে কেমন পরহেজ করা উচিত সেই সম্পর্কে উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ জমীনে সাধারণতঃ দু'ধরনের মাঠ থাকে, কিছু মাঠে ফসল ফলায় আর কিছু অংশ ফাঁকা চারণ ভূমি থাকে। ফাঁকা মাঠে রাখাল তার পশু চরায়। কিন্তু ফসলযুক্ত মাঠ হচ্ছে তার পশুর জন্য নিষিদ্ধ। সুতরাং সে নিষিদ্ধ ফসলের মাঠে তার পশু ঢুকে পড়ার ভয়ে পশুগুলোকে সতর্কতার সাথে পাহারা দিতে থাকে। যাতে করে কোনো ভাবেই নিষিদ্ধ ক্ষেতে বা মাঠে তার পশু ঢুকে পড়ে মাঠের ফসল খেয়ে না ফেলে। অতপর রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

اَلاَ وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اَلاَ وَاِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهٗ

"সাবধান! নিশ্চয়ই প্রত্যেক বাদশাহ্র একটি নিষিদ্ধ চারণভূমি বা মাঠ থাকে। মনে রেখ, আল্লাহ্র নিষিদ্ধ চারণভূমি বা মাঠ হলো তাঁর হারাম জিনিসগুলো।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এখানে উদাহরণ পেশ করে বলেন ঃ প্রত্যেক রাজা-বাদশাহর নিষিদ্ধ একটি এরিয়া বা এলাকা থাকে যেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্রও একটি নিষিদ্ধ এরিয়া আছে। আর তা হলো তার হারাম জিনিসগুলো। সুতরাং আল্লাহ্র এসব হারাম জিনিস থেকে মানুষকে সতর্ক থাকার জন্য হাদীসে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। হাদীসের পরবর্তী অংশে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اَلاَ وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ

"সাবধান! মানুষের দেহের মধ্যে এক টুকরো গোশ্‌ত আছে। যখন তা সুস্থ থাকে, তখন গোটাদেহটা সুস্থ থাকে; আর যখন তা দূষিত হয়ে যায়, তখন গোটা দেহটাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। সাবধান! আর তা হলো কল্‌ব বা অন্তকরণ।"

এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দেহের উপর হালাল-হারামের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। মানুষের ৩$\frac{১}{২}$ হাতের এই দেহের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। এটা ক্বল্‌ব বা অন্তঃকরণ দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং ক্বল্‌ব যদি পবিত্র, সুস্থ ও কলুষমুক্ত থাকে তা হলে তার দেহের প্রতিটি অংগ-প্রতঙ্গ সুস্থ ও কলুষমুক্ত থেকে ভাল, সৎ এবং কল্যাণকর কাজ করে। অপর পক্ষে ক্বল্‌ব বা অন্তঃকরণ যদি দূষিত ও অসুস্থ হয়ে যায় তা হলে তার প্রভাবে দেহের প্রতিটি অংঙ্গ-প্রতঙ্গ অন্যায়, অসৎ ও পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। সুতরাং ক্বল্‌ব এবং দেহকে সুস্থ, পবিত্র এবং কলুষমুক্ত রাখতে হলে হালাল পথে অর্থ উপার্জন করতে হবে। হালাল জিনিসগুলো গ্রহণ করতে হবে এবং হারাম ও সন্দেহজনক জিনিসকে পরিহার করতে হবে। সৎ ও কলুষমুক্ত জীবন যাপন করতে হবে। আর যত প্রকারের অন্যায়, অসৎ ও পাপের পথ রয়েছে তা বর্জন করতে হবে। কেননা মানুষ যখন কোন অন্যায় ও পাপ কাজ করে তখন তার অন্তঃকরণের উপর প্রভাব পড়ে। রাসূল (সাঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

اِذَا اَذْنَبَ الْاِنْسَانُ ثُقِلَ قَلْبِهِ

"মানুষ যখন কোনো গুনাহ্‌র কাজে জড়িয়ে পড়ে, তখন সাথে সাথেই তার ক্বল্‌বের উপর একটি কাল দাগ পড়ে যায়।" সুতরাং ক্বল্‌ব বা অন্তঃকরণকে পুত-পবিত্র রাখার জন্য সকল প্রকার হারাম এবং সন্দেহজনক জিনিসকে বর্জন করে শরীয়তে যা স্পষ্ট হালাল বা বৈধ তা গ্রহণ করতে হবে এবং সকল প্রকার গুণাহ্‌র কাজ থেকে দূরে থেকে সৎ ও

নেকীর কাজ করতে হবে, তাহলেই মানুষের গোটা দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ সৎ, কল্যাণকর ও নেকীর কাজে জড়িত হবে। আর তখনই মানুষের জন্য আদালতে আখেরাতে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করার মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা সম্ভব হবে।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে হাদীসটির যে ব্যাখ্যা পেশ করলাম, এতে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে তা হলো ঃ

● শরীয়তে যে সব জিনিসকে স্পষ্টভাবে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে তা গ্রহণ করতে হবে এবং যে সব জিনিসকে স্পষ্টভাবে হারাম করেছে তা থেকে দূরে থাকতে হবে এবং পরহেজ করতে হবে।

● স্পষ্ট হারাম বর্জন বা পরহেজ করার পর যেসব জিনিস সন্দেহজনক তাও বর্জন করতে হবে। কেননা, সন্দেহ জিনিস গ্রহণ করলে হারামে জড়িয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। সন্দেহজনক জিনিস বর্জন করা মুত্তাকীনদের বৈশিষ্ট্য।

● হারামে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে প্রয়োজন হলে হালাল জিনিসও বর্জন করতে হবে। যেমন একজন রাখাল মাঠে পশু চরানোর সময় অন্যের ক্ষেতের ফসল খেয়ে ফেলার ভয়ে সে নিষিদ্ধ মাঠের এরিয়া বা আইল থেকেও অনেক দূরে তার পশুগুলো পাহারা দিয়ে রাখে। যদিও আইল বা এরিয়া পর্যন্ত তার পশুগুলো খাবার অধিকার রাখে।

● ক্বল্‌ব বা মনকে পবিত্র এবং কলুষমুক্ত রাখার জন্য হালাল বা বৈধ উপায়ে উপার্জিত রুজি খেতে হবে এবং খারাপ, অন্যায় ও গুনাহ্‌র কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা, ক্বল্‌ব বা মনের ভাল-মন্দের উপর নির্ভর করে - দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গের ভাল-মন্দ কাজের তৎপরতা।

● জান্নাতে যেতে হলে বৈধ উপায়ে অর্জিত রুজি দ্বারা দেহ গঠন করতে হবে। কেননা এর উপর নির্ভর করছে ইবাদত কবুল হওয়া না হওয়া। হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ "হারাম মাল দ্বারা রক্তে মাংসে গঠিত দেহে আল্লাহ্‌র ইবাদত কবুল হয় না।" অন্য হাদীসে বলা হয়েছে "হারাম মাল দ্বারা গঠিত দেহ জান্নাত যাবার জন্য অনুপযোগী। বরং তার জন্য জাহান্নামই উপযোগী"।

আহবান ঃ সম্মানিত ভায়েরা/বোনেরা! আপনাদের সামনে এতক্ষণ পর্যন্ত হালাল-হারাম এবং সন্দেহজনক জিনিসের করণীয় সম্পর্কে হাদীসের যে ব্যাখ্যা পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ত্রুটি এবং বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তার জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর আমরা হাদীস থেকে যেসব বিষয়ের শিক্ষা পেলাম তা যেন বাস্তব জীবনে কার্যকরী করে আদালতে-আখেরাতে নাজাত লাভ করতে পারি, সেই তাওফীক কামনা করে হাদীসের দারস শেষ করছি। অয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।

পাঁচ

ঈমানের শাখা-প্রশাখা

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً - فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ : وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ -(مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ ঈমানের সত্তরটিরও বেশী শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্ব উত্তমটি হলো এ কথা বলা যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ্ বা মা'বুদ নেই এবং ক্ষুদ্রতম বা ছোটটি হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক কোনো জিনিষ সরিয়ে দেয়া। আর লজ্জাও ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। (বুখারী মুসলিম)

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ عَنْ-থেকে বা হতে। قَالَ- বলা বা বলেছেন। اَلْاِيْمَانُ-দৃঢ় ঈমান বা বিশ্বাস। بِضْعٌ-বেশী বা অধিক (৩ থেকে ৯ পর্যন্ত বেজোড় সংখ্যা)। سَبْعُوْنَ-সত্তর। شُعْبَةٌ -শাখা। اَفْضَلُ-সর্বোউত্তম। هَا-উহার বা তার। قَوْلُ-বলা। لَا -না বা নাই।

إِلٰهٌ-মা'বুদ।-إِلَّا-ছাড়া বা ব্যতীত। وَ -এবং। أَدْنَا -ক্ষুদ্রতম বা ছোট। إِمَاطَةٌ--দূর করা, অপসারণ করা। أَذٰى -কষ্টদায়ক বস্তু বা জিনিস। طَرِيْقٌ-রাস্তা। اَلْحَيَاءُ-লজ্জা।

সম্বোধন ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! আমি আপনাদের সামনে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এর বর্ণিত "ঈমানের শাখা-প্রশাখা" সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর হাদীসটি পাঠ এবং অনুবাদ পেশ করেছি। আমি যেন আপনাদের সামনে হাদীসটির ব্যাখ্যা সঠিক ভাবে তুলে ধরতে পারি, আল্লাহ্ তাআলার কাছে সেই তৌফিক কামনা করছি।

রাবী বা বর্ণনাকারীর পরিচয় ঃ নাম- আব্দুর রহমান। বংশীয় নাম- আবদি শামস (অরুণ দাস)। লকব বা পদবী নাম- আবু হুরাইরা। পিতার নাম- আমের বিন আবদি জিশ্‌শারা। তিনি দাওস গোত্রের ইয়েমেনের অধিবাসী ছিলেন। আবু হুরাইরা মদিনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু হুরাইরা নামকরণ সংক্রান্ত অনেকগুলো বর্ণনা পাওয়া যায়। কেউ বলেন যে, তিনি ছোট থেকে বিড়াল খুব ভাল বাসতেন। এজন্য তার সঙ্গী-সাথীরা আবু হুরাইরা (বিড়াল ওয়ালা) বলে ডাকতো। সহীহ্ বুখারীতেও বর্ণিত আছে যে, নবী (সাঃ) তাঁকে আবুহার বা আবু হুরাইরা বলে ডাকতেন। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) কয়েকবার মদীনার গভর্ণরের দায়িত্ব পালন করেন এবং মাঝে মধ্যে হযরত (রাঃ) মুয়াবিয়ার শাসন আমলে ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি ৫৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫,৩৭৪ । তিনি সর্বাধিক হাদীসের বর্ণনাকারী ছিলেন।

হাদীসটি গ্রহণকারী কিতাবের পরিচয় ঃ "মুত্তাফিকুন আলাইহি" বলতে বুখারী এবং মুসলিম শরীফকে বুঝানো হয়েছে। হাদীসের কেতাব দু'টি

"সিহাহ্ সিত্তাহ্" বা বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীসের কিতাবের ১ম শ্রেণীর হাদীসের কেতাব। সুতরাং হাদীসটি যে বিশুদ্ধ এতে কোনো সন্দেহ নেই।

হাদীসটি বর্ণনা করার সময়কাল ঃ যদিও হাদীস বর্ণনার সময়কাল নির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করা খুব কঠিন। তার পরেও আমার ধারণা হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার নবুয়তের প্রাথমিক যুগে মক্কায় বর্ণনা করেছেন। কেননা ঈমান সংক্রান্ত বিষয়গুলো নবুয়াতের প্রাথমিক যুগেই প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো। তবে এ বিষয়ে আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে হাদীসটির প্রাথমিক ধারণা পেশ করলাম। এখন হাদীসটির প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করছি। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً

"ঈমানের সত্তরটিরও বেশী শাখা-প্রশাখা রয়েছে।"

ঈমান কিঃ ? আরবী ঈমান শব্দটির অর্থ বিশ্বাস বা প্রত্যয়।

কিসে ঈমান আনতে হবেঃ? প্রধানত আল্লাহ্, ফেরেশতা, কেতাব, নবী-রাসুল, তাকদীর, পরকাল এবং কিয়ামতের মাধ্যমে পুনরুত্থান ইত্যাদির উপর ঈমান আনতে হবে।

কিভাবে ঈমান আনতে হবেঃ? ঈমানের মৌলিক উপাদান তিনটি –

১. 'তাশদিক বিল জিনান' অর্থাৎ অন্তরে বিশ্বাস।

২. 'ইক্‌রার বিল লিসান' অর্থাৎ মুখে স্বীকার।

৩. 'আ'মাল বিল আরকান' অর্থাৎ কাজে পরিণত।

উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতিতে ঈমান আনতে হবে। তা হলেই ঈমানের পূর্ণতা আসবে।

بِضْعٌ শব্দের অর্থ অধিক বা বেজোড়। অর্থাৎ ৩ হতে ৯ পর্যন্ত বেজোড় সংখ্যাকে বুঝায়। سَبْعُوْنَ অর্থ-সত্তর। সুতরাং بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ-

শব্দ দুটি দ্বারা ৭৩ হতে ৭৯ পর্যন্ত যে কোনো বেজোড় সংখ্যাকে বোঝায়। অতএব ঈমানের ৭৩ হতে ৭৯ পর্যন্ত যে কোনো বেজোড় সংখ্যক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তবে অত্র হাদীসে ঈমানের অসংখ্য শাখা-প্রশাখার মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যার মধ্যে ঈমানের দুই প্রান্তের দুই শাখা–সর্বউচ্চ ও সর্বনিম্ন এবং মাঝের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ শাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রান্তিক দুই শাখা যেমন ঃ

فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ

"আর তার (ঈমানের) মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হচ্ছে একথা বলা যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ্ বা মা'বুদ নেই এবং সর্বনিম্ন বা ক্ষুদ্রতম শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা"।

হাদীসে ঈমানের প্রান্তিক দু'টি শাখার মধ্যে 'হুকুকুল্লাহ্' এবং 'হুকুকুল ইবাদ' অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র অধিকার' এবং 'বান্দার অধিকার' উভয়ের উল্লেখ রয়েছে।(কেননা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র হক আদায় করলেই প্রকৃত মুমিন হওয়া যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার হক বা অধিকার আদায় করা না হয়। আল্লাহ্‌কে কেবলমাত্র ইলাহ্ বা মা'বুদ হিসেবে মেনে নেয়া, তার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা, আল্লাহ্‌কে পালনকর্তা, রিযিকদাতা, আইনদাতা এবং হায়াত-মযুতের মালিক হিসেবে মেনে নেয়ার মাধ্যমে 'হকুকুল্লাহ্' বা 'আল্লাহ্‌র হক' আদায় করা হয়। অনুরূপ ভাবে তাঁরই বান্দাদের উপকার তথা 'খিদমতে খালক' বা 'সৃষ্টির সেবা' অর্থাৎ মানুষের উপকার এবং দুঃখ-দুর্দশা দুর করার মাধ্যমে বান্দার যাবতীয় হক আদায় করা হয়।

হাদীসে ঈমানের ক্ষুদ্রতম শাখার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে 'রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়া'। যেমন– কাঁটা, কাঁচ ভাঙ্গা, কলার

খোসা, পাথর, ইটের টুকরা ইত্যাদি অনেক সময় রাস্তার উপর পড়ে থাকে,যা মানুষের পথ চলার সময় বেখেয়ালে আঘাত লেগে বা পিছলে পড়ে ক্ষতি হবার সমূহ আশংকা রয়েছে। এমতাবস্থায় উক্ত জিনিস রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলাও ঈমানের একটি ছোট-খাট শাখা।

এখানে ঈমানের দুই প্রান্তের দুই শাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ জন্যই দুই প্রান্তের মাঝখানে যত ভাল ভাল কাজ আছে সবই ঈমানের বিভাগ ও শাখা-প্রশাখা। যেমন– মানুষের সাথে হাঁসি মুখে কথা বলাও ঈমানের কাজ বলে রাসূল (সাঃ) অন্য হাদীসে উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং একজন পূর্ণ মুমিন হতে হলে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ এবং সার্বভৌমত্ব যেমন স্বীকার করতে হবে, তেমনি খিদমতে খালক বা সৃষ্টির সেবা তথা মানুষের দুঃখ-কষ্ট দুর করার জন্য তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। অন্য হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেনঃ

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ

"পৃথিবীতে যা কিছু আছে তোমরা তাদের প্রতি দয়া করো, তাহলে আল্লাহও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" (তিরমিযী শরীফ)

অতঃপর আলোচ্য হাদীসে ঈমানের মধ্যবর্তী শাখার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার কথা উল্লেখ করে নবী (সাঃ) বলেনঃ

وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ

"লজ্জাও ঈমানের একটি (গুরুত্বপূর্ণ) শাখা" ঈমানের ৭৩ থেকে ৭৯ পর্যন্ত শাখা-প্রশাখার মধ্যে এখানে তৃতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ শাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাহলো–'হায়া' বা 'লজ্জা'। ঈমানের সাথে লজ্জার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, ঈমান যেমন মানুষকে অন্যায়, অপকর্ম এবং গুনাহ্‌র কাজ থেকে দুরে রাখে তেমনই লজ্জাও মানুষকে অন্যায়, অপকর্ম এবং পাপের কাজ হতে বিরত রাখে।

একজন মানুষকে তিনটি কারণে অন্যায় এবং পাপের কাজ থেকে বিরত

রাখে। যেমনঃ

(১) তাক্ওয়া বা আল্লাহ্র ভয় (২) হায়া বা লজ্জা এবং (৩) শাস্তির ভয়। যদি কোনো মানুষের মধ্যে আল্লাহ্র ভয় থাকে তাহলে সে কোনো দিনই অন্যায় বা পাপের কাজ করতে পারে না। কিন্তু যদি তার মধ্যে আল্লাহ্র ভয় না থাকে তাহলে লজ্জা থাকার কারণে অনেক অন্যায় এবং পাপের কাজ থেকে সে বিরত থাকে। আর যদি তার মধ্যে লজ্জাও না থাকে তাহলে শাস্তির ভয়ে সে অন্যায় এবং অপকর্ম হতে দূরে থাকে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের সমাজের অধিকাংশ লোকদের মধ্যে তাক্ওয়া যেমন নেই, তেমনি লজ্জাও হারিয়ে গেছে। অপর পক্ষে রাষ্ট্রীয় ভাবে শাস্তিরও তেমন বিধান জারি নেই। যার ফলে দিন দিন অন্যায়, অপকর্ম, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা এবং পাপের কাজ বৃদ্ধি পেতেই থাকছে। এর পেছনে একমাত্র কারণ হলো রাষ্ট্রীয় ভাবে আল্লাহর বিধান জারি না থাকা।

লজ্জাশীলতা মানব চরিত্রের এক মহৎ গুণ **"একবার রাসূল (সাঃ) রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি দেখলেন একজন (মদীনাবাসী) আনসারী অন্য এক আনসারীর লজ্জা ভাঙ্গার চেষ্টা করছেন (যিনি ছিলেন অত্যন্ত লজ্জাশীল)। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার এ চেষ্টা দেখে বললেনঃ "তাকে ছেড়ে দাও"। কেননা, লজ্জা হচ্ছে ঈমানের অংশ"।** (বুখারী)

সুতরাং মানুষের মধ্যে হায়া বা লজ্জা থাকা অপরিহার্য। কেননা, এটা ঈমানের সহায়কশক্তি। পক্ষান্তরে লজ্জাহীনতা মানুষকে যে কোনো অশ্লীল কাজে জড়িয়ে দিয়ে গুনাহ্গার বানিয়ে দেয় এবং সমাজের মধ্যে বেহায়াপনা এবং অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেয়। আর আখেরাতে কঠিন আযারের মধ্যে নিক্ষেপ করে।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা / বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে ঈমানের শাখা-প্রশাখা সংক্রান্ত হাদীসের যে ব্যাখ্যা পেশ করলাম তা থেকে আমাদের জন্য যে সব শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে তা হলো ঃ

● অত্র হাদীসে ঈমানের পরিসংখ্যানগত দিকের ধারণা পাওয়া গেছে। আর ঈমানের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাখা এবং মধ্যবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা সম্পর্কে ধারণা লাভ হয়েছে।

● ঈমানের প্রথম শর্ত হলো তাওহীদে বিশ্বাস। কেননা, একজন মানুষকে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতে হলে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের ঘোষণা অবশ্যই দিতে হবে। নচেৎ সে মুমিন বলে গণ্য হবে না এবং তার কোনো ভালো বা নেক কাজ গ্রহণযোগ্যও হবেনা।

● ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা হলো সৃষ্টির সেবা করা ও মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করা। সুতরাং রাস্তায় যদি কোনো কাঁটা, ইটের টুকরো, কাঁচের ভাঙ্গা এবং কলার খোসা বা এ জাতীয় অন্য কোনো ক্ষতিকর জিনিস পড়ে থাকে, তাহলে তা সরিয়ে ফেলা। কেননা মানব সেবার যে কোনো কাজ তা যতই ছোট হোক না কেন তা ঈমানের শাখার মধ্যে গণ্য হবে।

● ঈমানের অসংখ্য শাখার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো লজ্জাশীলতা। অতএব প্রত্যেক মুমিন নারী-পুরুষের মধ্যে লজ্জা থাকা জরুরী। কেননা যার মধ্যে যতো লজ্জা থাকবে সে ততো অন্যায়, অশ্লীল এবং পাপের কাজ থেকে বিরত থাকবে।

● হাদীসে 'হুকুকুল্লাহ্' এবং 'হুকুকুল ই'বাদ' এর মধ্যে যতো কাজ আছে তা সবই ঈমানের শাখা-প্রশাখার মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং প্রতিটি ভাল এবং কল্যাণকর কাজই হলো ঈমানের কাজ।

আহবান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে ঈমানের শাখা-প্রশাখা সংক্রান্ত হাদীসটির যে ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ত্রুটি অথবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তার জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর এই হাদীসে আমাদের জন্য যে সব শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে তা যেন বাস্তব জীবনে আমল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে হাদীসের দারস শেষ করছি।

ছয়

নারীদের বেশী জাহান্নামে যাবার কারণ?

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ:خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اَضْحٰى اَوْ فِطْرٍ اِلَى الْمُصَلّٰى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ ، فَاِنِّىْ اُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ ، فَقُلْنَ وَبِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَّدِيْنٍ اَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدَا كُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ اَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ بَلٰى- قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا قَالَ اَلَيْسَ اِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ بَلٰى- قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا - (مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ)

হাদীসের অনুবাদ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ একবার ঈদুল আযহা (বকরাঈদ) অথবা ঈদুল ফিতরের দিন (রাবীর সন্দেহ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ঈদগাহে গেলেন এবং উপস্থিত মহিলাদের কাছে পৌঁছলেন। অতঃপর তাদেরকে বললেনঃ

হে নারী সমাজ! তোমরা দান-খয়রাত করো। কেননা, আমাকে জানানো হয়েছে যে, দোযখের অধিকাংশ বাসিন্দা তোমাদের নারীরাই হবে। তারা বললোঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন্‌ কারণে ? হুজুর উত্তরে বললেনঃ তোমরা অপরের প্রতি বেশী লা'নত (অভিশাপ) দিয়ে থাকো এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো। যারা বুদ্ধি ও দ্বীনদারীতে অপূর্ণ এমন কেউ যে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান পুরুষের বুদ্ধি তোমাদের কোনো একজন অপেক্ষা বেশী হরণ করতে পারে, তা আমি আর দেখিনি। তারা প্রশ্ন করলোঃ আমাদের দ্বীন ও বুদ্ধির অপূর্ণতা বলতে কি বুঝায় ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ ? হুজুর উত্তরে বললেনঃ নারীদের স্বাক্ষ্য কি পুরুষের স্বাক্ষের অর্ধেকের সমান নয় ? (তার কারণ, কুরআনে দুইজন নারীর স্বাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান উল্লেখ রয়েছে)। তারা উত্তরে বললোঃ জ্বী হ্যাঁ! হুজুর বললেনঃ এটাই নারীর বুদ্ধির অপূর্ণতা। অতঃপর হুজুর জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের কারও যখন মাসিক ঋতু হয় তখন সে যে, নামায-রোজা করে না (করতে পারে না) এটা কি সত্য নয় ? উত্তরে তারা বললোঃ জ্বী হ্যাঁ হুজুর। নবী করীম (সাঃ) বললেনঃ এটাই তোমাদের দ্বীনের অপূর্ণতা। (বুখারী মুসলিম)

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ عَنْ-থেকে। خَرَجَ -বের হলেন। فِىْ- মধ্যে। اَضْحٰى-ঈদুল আয্‌হা বা বকরাঈদ। اَوْ-অথবা। فِطْرٍ-ঈদুল ফিত্‌র। اِلٰى-দিকে বা প্রতি। الْمُصَلّٰى-নামাযের স্থান (ঈদগাহ্‌)। فَمَرَّ-অতঃপর পৌঁছলেন। النِّسَاءِ -নারী। يَا-হে। مَعْشَرَ النِّسَاءِ-নারী সমাজ। تَصَدَّقْنَ-তোমরা দান-খয়রাত করো। فَاِنِّىْ -কেননা, নিশ্চয় আমি। اُرِيْتُكُنَّ-তোমাদেরকে

দেখেছি। أَكْثَرَ-অধিক বা বেশী। أَهْلِ النَّارِ-দোযখের অধিবাসী। فَقُلْنَ-অতপর তারা (নারীরা) বললো। وَبِمَ -কেন বা কোন অপরাধে। تكثرن-তোমরা অধিকাংশ। اَللَّعْنَ-অভিশাপ দাও। تَكْفُرْنَ-অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। الْعَشِيْرَ-তোমাদের স্বামীদের। مَا رَأَيْتُ-আমি দেখিনি। نَاقِصَاتِ-ঘাটতি বা কমতি। عَقْلِ-জ্ঞান, বুদ্ধি। اَذْهَبَ - হরণ করা, কেড়ে নেয়া। اَلرَّجُلُ الْحَازِم-বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান পুরুষ। اِحْدَ اكُنَّ -তোমাদের একজন। قُلْنَ-তারা বললো। وَمَا نُقْصَانُ-ঘাটতি কি? دِيْنِنَا-আমাদের দ্বীনে। وَعَقْلِنَا এবং আমাদের বুদ্ধিতে। اَلَيْسَ -কি নয়? شَهَادَةُ -স্বাক্ষ্য। اَلْمَرْاَةِ -স্ত্রীলোক। مِثْلُ-অনুপাত বা তুলনায়। نِصْفِ-অর্ধেক। اَلرَّجُلُ-পুরুষ। بَلٰى -হ্যাঁ। فَذٰلِكَ-অতঃপর এটাই। عَقْلِهَا-তাদের বুদ্ধি। اِذَا-যখন। حَاضَتْ-হায়েজ বা ঋতু। لَمْ-تُصَلِّ-নামায পড় না। لَمْ تَصُمْ-রোযা রাখ না। نُقْصَانِ-ঘাটতি। دِيْنِهَا-তাদের দ্বীন। مُتَّفِقُ عَلَيْهِ-উহার উপর উভয়ে একমত হয়েছেন অর্থাৎ বুখারী মুসলিম।

সম্বোধন ঃ দারসে হাদীস মাহফিলে/প্রোগ্রামে/অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্সালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে সেহাহ্ সিত্তাহ হাদীস গ্রন্থের মধ্যে প্রথম শ্রেণীভুক্ত বোখারী এবং মুসলিম শরীফে গৃহীত বিশিষ্ট সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি পাঠ এবং অনুবাদ করেছি। আল্লাহ্পাক যেনো আমাকে আপনাদের সামনে হাদীসটির ব্যাখ্যা এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা পেশ করার তাওফিক দান করেন। আমিন।

রাবী বা বর্ণনাকারীর পরিচয় ঃ নাম–সা'দ। ডাকনাম– আবু সাঈদ। খুদরাহ্ বংশের সন্তান হবার কারণে খুদারী বা খুদরী বলা হয। পিতার নাম–মালিক ইবনে সিনান। উহুদের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। এ যুদ্ধে রাসূলে করীম (সাঃ) আহত হলে তিনি তাঁর পবিত্র রক্ত চুষে গিলে ফেলেন। এতে রাসূল (সাঃ) মন্তব্য করেনঃ আমার রক্ত যার রক্তে মিশে গেছে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। মাতার নাম–উনায়সা বিনতু আবী হারিসা। আবু সাঈদ জন্মগ্রহণ করনে হিজরতের ১০ বছর পূর্বে ৬১৩ খৃষ্টাব্দে ইয়াসরীবে (মদীনায়)। আবু সাঈদ মুসলিম মা-বাবার কোলেই বেড়ে উঠেন। তাঁর মৃত্যুক্ষণ সম্পর্কে কেউ বলেন ৭৪ হিজরীতে। আবার কেউ বলেন ৬৪ হিজরীতে। মৃত্যুর সময় তার অনেক বয়স হয়েছিলো। কারো মতে তিনি ৭৪ বছর বেঁচে ছিলেন। আবার কারো মতে ৮৬ বছর বয়সে মারা যান এবং এটাই সঠিক।

তিনি একজন বিশিষ্ট হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১,১৭০টি।

হাদীসটি বর্ণনাকারী কেতাবদ্বয়ের পরিচয় ঃ হাদীসের পরিভাষায় 'মুত্তাফিকুন আলাইহ্' বলতে বুখারী এবং মুসলিম শরীফকে বুঝানো হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য এক, দুই ও তিন নম্বর হাদীসে দেখুন।

হাদীসটি বর্ণনার সময়কাল ঃ আল-কুরআন অবতরণের সময়কাল যেভাবে সহজে অনুধাবন করা যায়। হাদীসের ক্ষেত্রে সেভাবে পাওয়া যায় না। তার পরও হাদীসটির বিষয়বস্তু থেকে অনুভব করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাদীসটি মাদানী জীবনের মধ্যবর্তী অথবা তারও কিছু আগে বর্ণনা করেন। কেননা, হাদীসে ঈদের জামায়াতের কথার উল্লেখ রয়েছে। আর জামায়াতে ঈদের নামায আদায়ের পদ্ধতি হিজরতের পর মাদানী জীবনে চালু হয়। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে তৎকালীন সময়

মদীনার লোকেরা দু'টি মেলা জাহেলী পদ্ধতিতে উৎযাপন করতো। রাসূল (সাঃ) তাদেরকে আহবান জানিয়ে বলেছিলেনঃ-মুসলমানদের জন্য এর চেয়েও দুটি আনন্দের দিন রয়েছে তা হলো-"ঈদুল ফিতর" এবং "ঈদুল আযহা।"

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে হাদীসটির অনুবাদ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করলাম। এখন আমি হাদীসটির প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করছি। নারীরা অধিকাংশই দোযখী এই সতর্কবাণী শুনাতে এবং তাদেরকে তা থেকে উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে গিয়ে নবী (সাঃ) বলেনঃ

خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اَضْحٰى اَوْ فِطْرٍ اِلَى الْمُصَلّٰى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ،

"একবার ঈদুল আযহা (বকরাইদ) অথবা ঈদুল ফিতরের দিন (রাবীর সন্দেহ্) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ঈদগাহে গেলেন এবং (জামায়াতে উপস্থিত) মহিলাদের কাছে হাজির হলেন।"

মদীনার যুগে ঈদের নামায মাঠে পড়ার পদ্ধতি চালু হবার পর বর্ণনাকারীর সন্দেহ্ রয়েছে তা ঈদুল আযহার দিনও হতে পারে। আবার ঈদুল ফিতরের দিনও হতে পারে। যাই হোক কোনো এক ঈদের মাঠে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেদিকে মহিলারা অবস্থান করেছিলো সেইদিকে চলে গেলেন এবং তাদের জন্য পৃথকভাবে নছিহত করলেন।

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) মহিলাদেরকে ঈদের মাঠে হাজির হবার জন্য তাগাদা দিতে গিয়ে অনেক হাদীসই উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে যেমন তিনি বলেনঃ "মেয়েরা হায়েজ অবস্থায় থাকলেও যেন তারা

ঈদগাহে হাজির হয় এবং (নামায না পড়ে) দোয়াতে শরীক হয়"। অন্য হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেনঃ "মহিলারা যেন অন্যের চাদর ধার করে হলেও ঈদের মাঠে যায়।" উক্ত হাদীস দু'টি থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল (সাঃ) মহিলাদরকে ঈদের মাঠে যাবার জন্য তাগাদা দিতেন এবং মহিলারাও স্বতস্ফূর্তভাবে পর্দার সাথে ঈদগাহে সমবেত হতো।

প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূল (সাঃ) একেবারে মহিলাদের কাছে পৌছে গেলেন এতে কি পর্দার খেলাপ হলো না ? উত্তরে বলা যায়, হুজুরের সময় মহিলারা অত্যন্ত সাদাসিধে এবং সালিন ভাবে চলাফেরা করতো। তারা শরীর ঢেকে পর্দার সাথে ঈদ ও জুমুয়ার নামাজে হাজির হতো এবং পুরুষদের থেকে পৃথক হয়ে বসতো। তাদের শরীর ঢেকে ও পবিত্রতা রক্ষা করে চলার বিধান সূরা নূর এবং আহযাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সূরা আহ্যাবে উল্লেখ রয়েছে **"হে নবী আপনার স্ত্রীদেরকে, আপনার মেয়েদেরকে এবং মু'মিনদের স্ত্রীদেরকে বলে দিন যে, তারা যেন নিজেদের (শরীরের) উপর চাদর ঝুলিয়ে দেয়।"** সুতরাং বলা যায় মহিলারা ঈদের জামায়াতে পর্দার সাথে পৃথকভাবে সমবেত ছিলো এবং সেখানে গিয়ে কেবলমাত্র মেয়েদের সম্পর্কেই গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ বাণী শুনিয়েছিলেন; যা ছিলো রাসূল (সাঃ) এর দায়িত্ব। রাসূল (সাঃ) ঈদগাহে সমবেত মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَاِنِّىْ اُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ

"হে নারী সমাজ! তোমরা দান-খয়রাত করো। কেননা, আমাকে জানানো হয়েছে যে, অধিকাংশ মহিলারাই দোযখী হবে।" হাদীসের এই অংশে মহানবী (সাঃ) মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে,

তোমরা বেশী বেশী করে দান -সদকাহ্ করো, কেননা বেশীর ভাগ মহিলারাই জাহান্নামী হবে। এখানে রাসূল (সাঃ) বলছেন যে, 'আমাকে জানানো হয়েছে' অথবা 'দেখানো হয়েছে' উভয় হতে পারে। যদি 'জানানো হয়েছে' বলা হয় তাহলে, জীবরাঈল (আঃ) অহীর মাধ্যমে রাসূলকে জানিয়ে দিয়েছেন। আর যদি 'দেখানো হয়' তাহলে, বলা যায় যে, মে'রাজের রাতে রাসূল (সাঃ) কে জীবরাঈল (আঃ) সাথে করে নিয়ে জান্নাত এবং জাহান্নাম পরিদর্শন করিয়েছিলেন। যেখানে রাসূল (সাঃ) অধিকাংশ মহিলাদেরকে জাহান্নামী দেখে 'জীবরাঈলকে প্রশ্ন করেছিলেন' কোন্ কারণে মেয়েরা এত জাহান্নামী ? উত্তরে জীবরাঈল (আঃ) বলেছিলেনঃ মহিলারা তাদের স্বামীর প্রতি অভিশাপ অর্থাৎ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে এজন্যই তারা বেশী জাহান্নামী।

হাদীসের এই বাক্যে মেয়েদেরকে নসীহত করতে গিয়ে বেশী বেশী দান-খয়রাত করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। এতে বুঝা যায় যে, দান-খয়রাত এমনই এক আ'মল যার প্রেক্ষিতে অনেক গোনাহ্ থেকে মুক্ত করে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে দেয়। সুতরাং এখানে দান-খয়রাতের গুরুত্ব অত্যধিক বেশী তা বুঝা যাচ্ছে। সুতরাং শুধু মহিলারাই নয় পুরুষদেরও দান-খয়রাতের হাত প্রসারিত করা উচিত। রাসূল (সাঃ) নারীদের ব্যাপারে এই কথা বলার প্রেক্ষিতে সমবেত মহিলারা রাসূল (সাঃ)কে প্রশ্ন করে জানতে চায় যে,

فَقُلْنَ وَبِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟

"তারা বললোঃ কোন্ অপরাধে হে আল্লাহ্ রাসূল! (নারীরা বেশী জাহান্নামী হবে ?) প্রতি উত্তরে রাসূল (সাঃ) পর পর দু'টি কারণ উল্লেখ করে বলেন ঃ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ

"তোমরা অন্যের প্রতি বেশী বেশী লা'নত (অভিশাপ) করে থাকো এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো।"

নারীদের বেশী জাহান্নাম যাবার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দূর্বলতার কথা যা তাদের সৃষ্টিগত ভাবেই এই ধরনের অপবাদের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যে, তারা কথায় কথায় অভিশাপ দিয়ে বসে এবং স্বামীদের সামান্যতম লেন-দেনে ত্রুটি দেখা দিলেই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ফেলে।

লা'নত–অর্থ অভিশাপ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর কোনো বান্দাকে তার দরবার বা রহমত হতে দূর করে দেয়া। যা শুধু কাফেরদের জন্যই হয়ে থাকে। মুসলমান তো নয়ই বরং কুরআন-হাদীসে কাফের বলে উল্লেখ নেই এমন কোনো নির্দিষ্ট অমুসলমান (আহলে কেতাব) ব্যক্তির প্রতিও লা'নত করা জায়েজ নেই। লা'নতের উপযুক্ত নয় এমন কোনো ব্যক্তির প্রতি লা'নত করা হলে সে লা'নত লা'নতকারীর প্রতিই ফিরে আসে বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। অথচ নারীরাই অন্যের প্রতি লা'নত করতে বড়ই ওস্তাদ। তারা কথায় কথায় বলে থাকে, "তোর উপর আল্লাহ্‌র লা'নত", 'তুই ধ্বংস হয়ে যা," "আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূর হয়ে যা", ইত্যাদি কথা দ্বারা লা'নত করে থাকে। সুতরাং রাসূল (সাঃ) এর হাদীস অনুযায়ী অধিকাংশ লা'নতই যে তাদের প্রতি ফিরে আসে এবং তাদের জাহান্নামে যাবার কারণ হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তাদের দ্বিতীয় বদ অভ্যাস হলো, স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। স্ত্রীদের প্রতি কোনো কিছু দিতে গিয়ে কিম্বা সংসারে কোনো কাজে অথবা ব্যবহারে যদি কোনো এক সময় ঘাটতি হয়ে যায় তা হলে হঠাৎ করেই বলে ফেলে "তোমার সংসারে এসে কোনদিন আমি সুখ পেলাম না" "তোমার কাছে এসে আমি ভালো কিছু পরতে পারলাম না" "কোনো দিন

তোমার একটু ভালো ব্যবহার পেলাম না” “জীবন ভর তোমার দাসী হয়ে থাকতে হলো” ইত্যাদি কথা বলে স্বামীর অন্যসব অবদানকে অস্বীকার করে মনে কষ্ট দেয়। মানুষেরই হোক আর আল্লাহ্‌রই হোক কোনো অকৃতজ্ঞ বান্দাহ্‌কে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। যার কারণে স্বামীর প্রতি এই অন্যায় অকৃতজ্ঞতার কারণে মেয়েলোকেরা বেশী বেশী দোযখী হবে। যা রাসূল (সাঃ) মে'রাজের রাতে স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন।

অতঃপর রাসূল (সাঃ) মেয়েদের দু'টি ঘাটতির কথা উল্লেখ করে বলেনঃ

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدَاكُنَّ

“যারা বুদ্ধি ও দ্বীনদারীতে অপূর্ণ এমন কেউ যে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান পুরুষের বুদ্ধি তোমাদের কোনো একজন অপেক্ষা বেশী হরণ করতে পারে, তা আমি আর দেখিনি।” এখানে নারীদের পুরুষদের চেয়ে দু'টি ঘাটতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ (১) তাদের দ্বীনের ঘাটতি এবং (২) বুদ্ধির ঘাটতি। কেননা, পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের দ্বীনের ঘাটতি রয়েছে এবং বুদ্ধিরও ঘাটতি রয়েছে। রাসূল (সাঃ) ঈদগাহে সমবেত মহিলাদেরকে এ দু'টি ঘাটতির কথা উল্লেখ করলে, উপস্থিত মহিলারা রাসূল (সাঃ)কে প্রশ্ন করলো ঃ

وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟

“হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের দ্বীন এবং বুদ্ধির ঘাটতি কি ?”

তখন প্রতি উত্তরে রাসূল (সাঃ) তাদের উক্ত দু'টি ঘাটতির প্রথমটির কারণ উল্লেখ করে বললেনঃ

اَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟
قُلْنَ بَلٰى- فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا

“নারীদের স্বাক্ষ্য কি পুরুষের স্বাক্ষ্যের অর্ধেকের সমান নয় ? তারা উত্তরে বললোঃ জি হ্যাঁ! হুজুর বললেনঃ এটাই হলো নারীর বুদ্ধির অপূর্ণতা।”

অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) পুরুষদের চেয়ে নারীদের বুদ্ধির ঘাটতির কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি প্রশ্ন আকারেই তাদের বললেনঃ নারীদের স্বাক্ষ্য কি পুরুষদের স্বাক্ষ্যের অর্ধেকের সমান নয় ? তাতে তারা স্বীকার করে বলেছিলো, জি হ্যাঁ হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! আপনার কথায় আমরা একমত। সাথে সাথে রাসূলও তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন, এটাই হলো- নারীদের বুদ্ধির ঘাটতি। উপস্থিত মহিলাদের রাসূলের কথায় একমত হবার কারণ হলো, তারা ইতোমধ্যে আল-কুরআনের মাধ্যমে জানতে পেরেছে দু’জন নারীর স্বাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান। সুতরাং তারা আর পাল্টা প্রশ্ন না করে সাথে সাথে স্বীকার করে নিয়েছে।

অপূর্ণ বুদ্ধি ঃ কুরআন এবং হাদীসে নারীদের বুদ্ধি পুরুষদের চেয়ে কম বলে উল্লেখ করা হয়েছে তা আধুনিক বিজ্ঞানে প্রমাণ করে দিয়েছে। বিজ্ঞানীদের সর্বসম্মত মত হলো এই যে, মানুষের বুদ্ধির এই তারতম্য তাদের মগজের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। কেননা, একজন নির্বোধ বোকা লোকের মগজ হতে একজন অতি বুদ্ধিমান লোকের মগজের ওজন অনেক বেশী। অনুরূপ ভাবে পুরুষদের মগজের ওজন নারীদের তুলনায় গড়ে অনেক বেশী। পুরুষদের মগজের সাধারণ ওজন ৪৯$\frac{১}{২}$ উকিয়া, আর নারীদের হচ্ছে- ৪৪ উকিয়া। (আরবীয় ওজন)

২৭৮ জন পুরুষের মগজ ওজন করে দেখা গেছে যে, বড় মগজের ওজন ৬৫ উকিয়া এবং সর্বাপেক্ষা ছোট ওজনের মগজ হলো ৩৪ উকিয়া। অপরপক্ষে ২৯১ জন নারীর মগজ মেপে দেখা গেছে যে, সর্বাপেক্ষা বড় মগজের ওজন ৫৪ উকিয়া এবং সবচেয়ে ছোট মগজের ওজন ৩১

উকিয়া। (আল্ মারআতুল মুসলিমা'- ফরীদ ওয়াজ্দী')।

তবে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কিভাবে একজন পুরুষের উপর মহিলা নেতৃত্ব কর্তৃত্ব করছে ? তাহলে এর উত্তর হবে এই যে, আসলে তুলনা হবে বিচক্ষণের সাথে বিচক্ষণের। দেশের কোনো বিচক্ষণ নারীর তুলনা করতে হলে সেই দেশের বিচক্ষণ পুরুষের সাথে তুলনা করতে হবে। একজন বিচক্ষণ নারীর সাথে আর একজন বোকা পুরুষের তুলনা করলেতো চলবে না! কেননা, পুরুষ এবং নারীর জ্ঞান-বুদ্ধি সকলের একই সমান নয়। সুতরাং বিচক্ষণের সাথে বিচক্ষণের তুলনা করলে ঠিকই দেখা যাবে এই বিচক্ষণ পুরুষের চেয়ে ঐ বিচক্ষণ মহিলার বুদ্ধির ঘাটাতি রয়েছে। তবে সমাজে একটা বিষয় চালু আছে যে, মহিলাদের কোনো পরামর্শ নেয়া যাবে না। কেননা, তারা কূ-বুদ্ধি দিয়ে আদম (আঃ) কে গন্দম ফল খাওইয়ে বেহেশত থেকে বিতাড়িত করেছিলো। আসলে কিন্তু ঘটনা তা নয়। কুরআনে উল্লেখ রয়েছে তারা উভয়েই শয়তানের প্ররচনায় আল্লাহ্র নির্দেশ ভুলে গিয়ে গন্দম ফল খেয়ে ফেলেছিলো। সুতরাং খালি খালি মেয়েদেরকে এককভাবে দায়ী করে তাদের পরামর্শ নেয়া থেকে দূরে থাকা ঠিক হবে না। সংসার এবং দেশ পরিচালনার জন্যও রাসূল (সাঃ) তাঁর বিবিগণের সাথে পরামর্শ করতেন। ফলে আমাদেরও সংসার এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নিজেদের স্ত্রীদের সাথেও প্রয়োজনে পরামর্শ করা উচিত।

অতপর নারীদের দ্বিতীয় ঘাটতির কারণ উল্লেখ করে রাসূল (সাঃ) বললেনঃ

اَلَيْسَ اِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ بَلٰى–
قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا

"তোমাদের যখন কারো মাসিক ঋতু হয় তখন তো সে নামাজ রোজা করে না বা করতে পারে না এটা কি সত্য নয় ? তারা উত্তরে বললোঃ জ্বী হ্যাঁ। হুজুর বললেনঃ এটাই তাদের দ্বীনের অপূর্ণতা।"

নারীদের দ্বীনের ঘাটতির কারণ মাসিক ঋতু বা হায়েজ। এটা তাদের ক্ষমতাধীন নয়। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দেয়া এক প্রকারের রোগ। ইসলামী শরীয়তে মেয়েদের দু'টি অবস্থায়- ঋতু কালীন ১০ দিন এবং নেফাস অর্থাৎ বাচ্চা ভুমিষ্ট হবার পর ৪০ দিন পর্যন্ত নামাযও পড়া যায় না এবং রোজাও রাখা যায় ন। অপর পক্ষে পুরুষদের এই ধরনের কোনো কিছুর সম্মুখীন হতে হয় না। ফলে পুরুষেরা উক্ত সময় নামাজ রোজা আদায়ের মাধ্যমে নারীদের চেয়ে দ্বীনের কাজে অগ্রগামী হয়ে যায়। সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যায় যে, নারীরা সৃষ্টিগত ভাবে পুরুষের সমান নয়।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে হাদীসটির যে ব্যাখ্যা পেশ করলাম তা থেকে আমাদের জন্য যে সব শিক্ষা রয়েছে তা হলোঃ

● মহিলাদেরকে পরিবেশ তৈরী করে ঈদের মাঠে নিয়ে যাওয়া এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং জুমুয়ার নামাজ জামাতের সাথে আদায়েরও ব্যবস্থা করা। এই জন্য সামাজিক ভাবে পর্দা প্রথা চালু করা এবং ঈদগাহে ও মসজিদে মহিলাদের নামাজ আদায় করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

● মা-বোনদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে, যে কোনো কারণেই হোক না কেন নিজের ছেলে-মেয়ে সহ অন্যান্য যে কোনো লোককে (কাফের বাদে) লা'নত বা অভিশাপ বা বদ দোআ না দেয়া। কেননা অভিশপ্ত ব্যক্তি অভিশাপের উপযুক্ত না হলে সেই অভিশাপ নিজের উপর বর্তাবে

এবং পরিনামে জাহান্নামে যেতে হবে।

● কোনো স্ত্রী যেন আপন স্বামীর প্রতি কখনো কোনো সময় নাশুকরী বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে। কেননা, কৃতজ্ঞ বা অল্পে তুষ্ট নারী যেমন স্বামীর দোআ এবং ভালবাসা পায় তেমনি আল্লাহ্ও সন্তুষ্ট হন।

● নারীদের উচিত বেশী বেশী করে দান-খয়রাত করা। কেননা, রাসূলের নসিহত অনুযায়ী তাদের দু'টি অপরাধ–অভিশাপ এবং নাশুকরির কারণে জাহান্নাম থেকে বাঁচার বিশেষ ব্যবস্থা হলো দান-খয়রাত করা।

● পুরুষদের উচিত নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সংসার এবং নিজের সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে পরামর্শ করা। এতে সংসারে শৃংখলা এবং শান্তি থাকে। তবে পুরুষদেরকে স্ত্রীদের পরামর্শ বাছাই করার যোগ্যতা থাকতে হবে। কেননা, নারীদের সকল পরামর্শ গ্রহণ করা ঠিক হবে না।

আহ্বান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে নারী-পুরুষের পার্থক্য সংক্রান্ত হাদীসটির যে ব্যাখ্যা পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ত্রুটি অথবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর অত্র হাদীস থেকে যেসব শিক্ষনীয় দিক বিশেষ করে মেয়েদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় রয়েছে তা যেন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে দারস শেষ করছি। মাআস্‌সালাম।

সাত

যে সব আ'মলের প্রতিদান কবরে পৌঁছতে থাকবে

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَاتَ اِبْنُ اٰدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهٗ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ، اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهٗ (مُسْلِمٌ)

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ জনাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ বনী আদম (মানুষ) যখন মারা যায়, তখন তার সমস্ত আ'মল (কার্যক্রম) বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আ'মলের সওয়াব (প্রতিদান) জারী থাকে। (১) সাদকায়ে জারীয়া, (২) এমন ইল্‌ম বা জ্ঞান যা থেকে লাভবান হওয়া যায় এবং (৩) সুসন্তান যে তার (মা-বাপের) জন্য দোয়া করে। (মুসলীম শরীফ)

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ عَنْ -থেকে। قَالَ-বলা বা বলেছেন। اِذَا-যখন। مَاتَ-মারা যায়। اِبْنُ اٰدَمَ-আদম সন্তান, (মানুষ) اِنْقَطَعَ-কেটে যায়, বন্ধ হয়ে যায়, ছিন্ন হয়ে যায়। عَمَلُهٗ-তার আ'মল। اِلَّا -ছাড়া, ব্যতীত। مِنْ-হতে। ثَلٰثٌ -তিন। صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ-জনকল্যাণমূলক কাজ। اَوْ-অথবা। يُنْتَفَعُ-ফায়দা বা লাভবান হওয়া যায়। بِهٖ-উহার সাথে। وَلَدٌ-সন্তান। صَالِحٌ-নেক বা

সৎ। يَدْعُوْ-সে দোয়া করে। لَهُ-তার জন্য।

সম্বোধন ঃ দারসে হাদীস প্রগ্রামে/অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে বিশিষ্ট সাহাবী এবং প্রশিদ্ধ বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসটি পাঠ এবং অনুবাদ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে হাদীস - টির দারস সঠিক ভাবে পেশ করার তৌফিক দান করেন। আমীন।

হাদীসটি বর্ণনাকারীর পরিচয় ঃ বিশিষ্ট সাহাবী এবং সর্বাপেক্ষা বেশী হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এর পরিচয় পাঁচ নম্বর হাদীসে দেখুন।

হাদীসটি গ্রহণকারী কেতাবের পরিচয় ঃ হাদীসটি ইমাম বোখারী এবং ইমাম মুসলিম উভয়ে আপন আপন কেতাবে একই রাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে উল্লেখিত হাদীসটি মুসলিম শরীফে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের মধ্যে বিশুদ্ধতার দিক থেকে মুসলিম শরীফের স্থান দ্বিতীয়। তবে নিঃসন্দেহে হাদীসটি সহীহ। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁর কিতাবে ইল্‌ম অর্জনের গুরুত্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! আপনাদের সামনে এতক্ষণ পর্যন্ত হাদীসটির প্রাথমিক ধারণা পেশ করলাম। এখন আমি হাদীসটির ব্যাখ্যা পেশ করছি। ইমাম মুসলিম (রঃ) যদিও তাঁর কেতাবে ইলম অর্জনের গুরুত্বের অধ্যায়ে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তথাপিও আরও যে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে সে অনুযায়ী শুধু ইলম অর্জনের গুরুত্বই নয় বরং মানুষ মারা যাবার পর মৃত ব্যক্তির সকল কার্যক্রমের প্রতিদান বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আ'মল বা কার্যক্রমের প্রতিদান হিসেবে সওয়াব

কবরে যেতে থাকে। সেই তিনটি আ'মল বা কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

إِذَا مَاتَ ابْنُ اٰدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ

"যখন বনী আদম তথা মানুষ মারা যায়, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি ছাড়া।"

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে,মানুষ যখন মারা যায় তখন দুনিয়ার সাথে কবরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির দুনিয়ার অর্জিত টাকা পয়সা, ধন-দৌলত, ক্ষমতা, আদিপত্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি,মান-সম্মান ইত্যাদি সবকিছু থেকে সে বঞ্চিত হয়ে যায়। দুনিয়ার কোনো কিছুই তার সাথে যায় না। এজন্য কুরআন এবং হাদীসে দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে মৃত্যুর পূর্বেই সমস্ত ভাল কাজ করার জন্য তাগাদা দেয়া হয়েছে। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-اَلدُّنْيَاءُ مَزْرَةُ الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ **"দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের খেত"**। এখানেই তাকে সঠিক ভাবে কুরআন সুন্নাহ্ অনুযায়ী জীবন যাপনের মাধ্যমে আখেরাতে নাজাতের জন্য প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে। মানুষের মরণ হয়ে গেলে তার দুনিয়ার জীবনের কোনো আ'মল বা কাজ করা মোটেই সম্ভব নয়। সে যে সব কাজ করে যাবে তা এখানেই সীলগালা করে দেয়া হবে। তবে দুনিয়ার তিনটি আ'মলের প্রতিদান বা সওয়াব সে কবরে থেকেই উপভোগ করবে। তবে শর্ত হলো তাকে মুসলমান হতে হবে। কেননা, যে ঈমান আনে নাই তার কোনো ভাল কাজ আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, সে যত ভাল এবং জনকল্যাণমূলক কাজই করুক না কেন।

মুমিন মুসলমানদের জন্য যে তিনটি দুনিয়ায় ভাল কাজের সওয়াব কবরে পৌঁছতে থাকবে, তার মধ্যে প্রথমটি হলো ঃ

صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ "সাদকায়ে জারিয়া" অর্থাৎ জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতিদান সেই মৃত ব্যক্তি তার কবরের জীবনে পেতে থাকবে। 'সাদকায়ে জারিয়া' বলতে মানব তথা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জীবের জন্য যা কল্যাণকর এবং উপকারী তাকেই বুঝানো হয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْيَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ اِنْسَانٌ اَوْ طَيْرٌ اَوْبَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

"কোনো একজন মুসলিম ব্যক্তি যদি একটি গাছ লাগাই অথবা বীজ ফলাই। আর তা থেকে কোনো মানুষ কিংবা কোনো পাখি বা কোনো পশু খায়, তবে তা সেই (বৃক্ষ রোপণকারী) লোকের জন্য সাদকা বা দান হয়ে যায়"। (বুখারী মুসলিম)

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, শুধু মানুষই নয় বরং অন্য যে কোনো সৃষ্টি জীব এই গাছের ডাল-পালা,পাতা, ফুল-ফল এবং ছায়া ইত্যাদি যার জন্য যা উপকারী হবে সেটাই বৃক্ষ রোপনকারী ব্যক্তির জন্য দান হিসাবে গণ্য হবে। আর এই গাছ যতদিন জীবিত থাকবে এবং সেই গাছ থেকে যারাই উপকৃত হবে ততদিন সেই ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় হোক আর মৃত অবস্থায় হোক তার প্রতিদান হিসেবে সওয়াব সে পেতে থাকবে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ জনক্যাণমূলক কাজ যেমন– রাস্তাঘাট, কালভার্ট, ব্রীজ, সরাইখানা, যাত্রী ছাউনী নির্মাণ করে এবং পানির জন্য টিউবওয়েল বা অন্য কোনো মাধ্যম দ্বারা পানির ব্যবস্থা করে এবং মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, কলেজ ইত্যাদি নির্মাণ করে দেয়, আর সেই সব জিনিস দ্বারা যত মানুষ উপকৃত হবে সেই ব্যক্তি এর প্রতিদান হিসেবে কবরে শুয়ে শুয়ে নেকী পেতে থাকবে। তবে শর্ত একটি, তা যেন দুনিয়ার কোনো সুনাম

সুখ্যাতির জন্য না হয়। বরং নিছক সৃষ্টির কল্যাণেই হয়। পক্ষান্তরে যদি কেউ মানুষকে বিপথগামী এবং ক্ষতি করার জন্য কোনো কিছু করে যায় তবে তারও প্রতিদান হিসেবে তার গোনাহ্ কবরে পৌঁছতে থাকবে এবং এর কারণে তাকে কবরে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

অতঃপর রাসূল (সাঃ) কবরে পৌঁছার দ্বিতীয় যেই আ'মলের কথা বলেন, তা হলো ঃ

أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ **"অথবা এমন ইলম বা জ্ঞান যার দ্বারা ফায়দা বা লাভবান হওয়া যায়।"** এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মৃত ব্যক্তির দুনিয়ায় রেখে যাওয়া যে ভাল কাজটির কথা উল্লেখ করেছেন, তা হলো উপকারী ইলম বা জ্ঞান। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি দুনিয়ায় এমন ইলমের ব্যবস্থা করে যাবে যেই ইলম বা জ্ঞান দ্বারা মানুষ নিজেকে চেনবে, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলকে চেনবে, মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারবে। পাক-নাপাক, হালাল-হারাম, আদব-কায়দা এবং সামাজিক শিষ্টাচার ইত্যাদি জানতে পারবে। চরিত্র গঠন করতে পারবে। নিজেকে সৎ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। আর এই চর্চার জন্য প্রতিদান হিসেবে কবরে তার সওয়াব পৌঁছতে থাকবে। দুনিয়াতে ইলমের চর্চার মাধ্যম হিসেবে যদি সে কাউকে ইলম শিক্ষা দিয়ে যায় অথবা কোনো বই লিখে যায় অথবা ইলম শিক্ষা দেয়ার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে যায় অথবা কাউকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিয়ে যায় অথবা ভাল কোনো পথ দেখিয়ে যায়, আর এসব ইলমের মাধ্যম দ্বারা যারা যারাই আ'মলের উপকৃত হবে তাদের প্রত্যেকের প্রতিদান হিসেবে সে ব্যক্তির কবরে সওয়াব পৌঁছতে থাকবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ دَعَا اِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ

مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا

"যে ব্যক্তি হেদায়েতের দিকে ডাকে আর সেই ব্যক্তির ডাকে সাড়া দিয়ে যারা হেদায়েতের পথে চলে সে তাদের সমান প্রতিদান পায়। কিন্তু এজন্য তাদের (হেদায়েত প্রাপ্ত ব্যক্তির) কোনো সওয়াবের কমতি করা হয় না"। (মুসলিম)

পক্ষান্তরে যদি কেউ আল্লাহ্ বিমুখ কোনো জ্ঞান এবং রাসূল (সাঃ) এর বিপরীত কোনো আদর্শ চালু করে যায় অথবা চরিত্র ধ্বংসকারী কালচারের ব্যবস্থা করে যায়, কিংবা যাহেলী কাজে দাওয়াতের জন্য কোনো দায়ী (আহবানকারী) রেখে যায়। আর তার দ্বারা যারা যারাই বিপথগামী হবে তাদের প্রত্যেকের গোনাহ্র অংশীদার হিসেবে তাকে কবরে শাস্তি ভোগ করতে হবে। যেমন **হাদীসে** এসেছে "অন্যায় ভাবে যত হত্যাই হবে তার প্রতিদান আদম (আঃ) এর (প্রথম) সন্তানকে ভোগ করতে হবে। কেননা সেই সর্বপ্রথম (তার ভাইকে) হত্যার মাধ্যমে হত্যার প্রথা চালু করে গেছে।"

এর পর তৃতীয় যে আ'মলটির প্রতিদান কবরে পৌঁছতে থাকবে তাহলো ঃ

أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ "অথবা নেক বা সুসন্তান যে তার (পিতা-মাতার) জন্য দোয়া করে।"

এখানে কবরে দুনিয়ার যে আ'মলটির সওয়াব পৌঁছবে তা বলতে গিয়ে রাসূল (সাঃ) সুসন্তানের দোয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। দুনিয়ার জীবনে যদি কোনো ব্যক্তি তার সন্তান-সন্ততিদেরকে সুশিক্ষা, চরিত্র মাধুর্য এবং আদর্শের দ্বারা সৎ, চরিত্রবান ও আদর্শবান করে গড়ে তুলে যায়। আর সেই সন্তান যদি তার মৃত পিতা-মাতার জন্য আল্লাহ্র কাছে মাগফেরাতের দোআ করে তবে সেই দোআ আল্লাহ্পাক কবুল করে

থাকেন। আল্লাহ্ নিজেই সন্তানদেরকে মৃত পিতা-মাতার জন্য দোআ শিখিয়ে দিয়ে বলেন ঃ

وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا

'হে রব! আমাদের পিতা-মাতার প্রতি সেই ভাবে রহম করো যেভাবে তারা আমাদের শিশুকালে দয়া-মায়া এবং রহম করে লালন-পালন করেছিলো।"

শুধু দোআই নয় বরং নেক সন্তানের দুনিয়ার জীবনের সকল ভাল আ'মল বা কাজের প্রতিদান হিসেবে মাইয়্যেত তার সওয়াব পাবে। পক্ষান্তরে যদি কোনো পিতা তার সন্তান-সন্ততিদের অসৎ-চরিত্রহীন, আল্লাহ্ বিমুখ এবং রাসূলের আদর্শ বিরোধী কোনো আদর্শের অনুসারী বানিয়ে যায়, তবে তার পাপের ভাগীও তার পিতা-মাতাকে হতে হবে এবং কবরে তার প্রতিদান হিসেবে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এজন্য প্রত্যেক পিতা-মাতার মৃত্যুর আগেই কাজ হবে সন্তানদেরকে সুশিক্ষা দেয়া, চরিত্র মাধুর্য এবং রাসূলের আদর্শের অনুসারী করে গড়ে তোলা। বয়স হলে নামাজী বানানো। বাল্যকাল থেকেই ইসলামী শিক্ষা তথা কুরআন হাদীসের শিক্ষা দেয়া। আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া। সৎ ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলা এবং রাসূলের অনুসারীদের সঙ্গী বানিয়ে দেয়া। এভাবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সন্তানদেরকে সুসন্তান বানিয়ে যাওয়া।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! উপরে উল্লেখিত হাদীসের তাৎপর্যের দিকে যদি নজর দেই, তাহলে বুঝতে পারা যায় যে, আমরা দুনিয়ার জীবনে কি করে যাচ্ছি। তা কি আমাদের কবরের জীবনের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না অকল্যাণ বয়ে আনবে তা আমাদের একটু আত্মবিশ্লেষণ করে দেখা উচিত। তাইতো দেখা যায়, বিপথগামী সন্তানেরা শরিয়াত যা বলে তা না করে বাপ মায়ের খাতিরের জন্য অথবা সামাজিকতা রক্ষার জন্য কিংবা বাপ-দাদার প্রথা হিসেবে মৃত্যুর পর তিন দিনের দিন মিলাদ করা, চেহলাম বা চল্লিশা করা, মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা ইত্যাদি ইত্যাদি। যার

অনেকগুলো হিন্দুয়ানী কালচার হতে এসেছে। যা বিদআত এবং শরীয়ত বিরোধী কাজ। যা মৃত ব্যক্তির কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই ডেকে আনে। আমাদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিৎ।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা / বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে হাদীসটির যে ব্যাখ্যা পেশ করলাম এতে যে সব শিক্ষা আমাদের জন্য রয়েছে তা নিম্নে আলোচা করা হলো ঃ

● আমাদের প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

● আখেরাতের পাথেয় দুনিয়ার জীবনে মৃত্যুর পূর্বেই সংগ্রহ করতে হবে।

● আলমে বরযখ বা কবরের জীবনে দুনিয়ার কোনো আ'মলের প্রতিদান হিসেবে সওয়াব বা নেকী লাভ করতে হলে প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানের উচিত। (১) সমাজকল্যাণমূলক এমন সব কাজ করে যাওয়া যা মানুষসহ সকল সৃষ্টি জীব উপকৃত হতে পারে। (২) ইলম বা জ্ঞান দানের জন্য বই লিখে যাওয়া, মাদ্রাসা, মক্তব, ইসলামী লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা। ভাল বা শরীয়ত সম্মত কোনো আ'মল চালু করে যাওয়া। (৩) সুসন্তান রেখে যাওয়া। যারা পিতা-মাতার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোআ করে এবং নিজে সৎ কাজ করে।

● প্রতিটি সন্তান-সন্ততির উচিত নিজে সৎ এবং নেক কাজ করা এবং পিতা-মাতার জন্য দোআ করা।

আহবান ঃ প্রিয় ভায়েরা-বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে হাদীসের যে দারস পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তার জন্য মহান আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা চাচ্ছি। আর অত্র হাদীস থেকে আমরা যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি।

আট

সত্যবাদিতার প্রতিদান এবং মিথ্যাচারিতার পরিণতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدِقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا - وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتّٰى يُكْتَبُ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا (مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ)

হাদীসের অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই সত্য কথা বলবে। কেননা, সত্যবাদিতা অবশ্যই নেকীর দিকে নিয়ে যায়, আর নিশ্চয়ই নেকী জান্নাতে নিয়ে যায়। আর মানুষ যখন সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্য বলতে বলতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন সে (ধীরে ধীরে) আল্লাহ্‌র খাতায় পরম সত্যবাদী হিসেবে লিখিত হয়ে যায়। অপর পক্ষে অবশ্যই তোমরা মিথ্যাচার হতে দূরে থাকবে। কেননা, মিথ্যাচা-রিতা অবশ্যই গুনাহ্‌র দিকে নিয়ে যায়, আর গুনাহ্‌ নিশ্চয়ই

জাহান্নামে নিয়ে যায়। আর কোনো মানুষ যখন সর্বদা মিথ্যা কথা বলতে থাকে এবং মিথ্যাচারিতায় অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন সে মহান আল্লাহ্র খাতায় চরম মিথ্যাবাদী বলে লিখিত হয়ে যায়। (বুখারী মুস-লিম)

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থঃ- عَلَيْكُمْ–তোমাদের উপর। بِ–সহ বা সাথে। اَلصِّدْقِ–সত্য কথা বলা বা সত্যবাদিতা।فَ– কেননা। اِنَّ–নিশ্চয়ই। يَهْدِىْ– পরিচালিত করে বা নিয়ে যায়। اِلٰى– দিকে। اَلْبِرِّ -নকী বা পুণ্য। وَ– এবং। اَلْجَنَّةِ–বেহেশত্। مَا يَزَالُ–সর্বদা। اَلرَّجُلُ ব্যক্তি। يَصْدُقُ - সে সত্য কথা বলে। يَتَحَرَّى–তালাশে বা অনুসন্ধানে থাকে। حَتّٰى– শেষ পর্যন্ত বা অবশেষে। يُكْتَبُ– লিখা হয়। عِنْدَ--নিকট বা কাছে। صِدِّيْقًا-পরম সত্যবাদী। اِيَّا– সাবধান। كُمْ-তোমরা। اَلْكِذْبَ– মিথ্যা বা মিথ্যাচার। اَلْفُجُوْرَ– অপকর্ম বা গুনাহ বা পাপ। يَهْدِىْ– পরিচালিত করে। اَلنَّارِ– দোযখ। يَكْذِبُ– মিথ্যা বলে। كَذَّابًا– চরম মিথ্যাবাদী।

সম্বোধন ঃ দারসে হাদীসের প্রোগ্রামে/বৈঠকে উপস্থিত সম্মানিত দ্বীনদার/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্সালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে সত্যবাদিতার প্রতিদান এবং মিথ্যাচারিতার পরিণতি সংক্রান্ত হাদীস পাঠ ও অনুবাদ করেছি। আল্লাহ পাক যেনো আমাকে আপনাদের সামনে এই গুরুত্বপূর্ণ হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা তুলে ধরার তৌফিক দান করেন। “অমা তাওফীকি ইল্লাহ্ বিল্লাহ্”।

হাদীসটির রাবীর পরিচয় ঃ রাবীর নাম-আবদুল্লাহ্। কুনিয়াত আবু - আবদির রহমান। উকবা ইবনে আবু মু'ইতের ছাগল চরাত তাই লোকজন তাকে "ইবন উম্মু আবদ" বলে ডাকতো।

পিতার নাম- মাসউদ। মাতার নাম- উম্মু আবদ। আবদুল্লাহ্ খুব সুন্দর করে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারতেন। তিনি মক্কাতেই ইসলাম কবুল করেন এবং রাসূলের বাড়ীতেই লালিত-পালিত হন। তিনি সার্বক্ষণিকভাবে রাসূলের সঙ্গী ছিলেন। তিনি ৩২ হিজরীতে হযরত উসমান (রাঃ) এর খিলাফতকালে প্রায় ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। খলীফা উসমান (রাঃ) তাঁর জানাযা পড়ান এবং তাঁর পিতা মাসউদের কবরের পার্শ্বে দাফন করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হলো- ৮৪৮ টি।

হাদীসটি গ্রহণকারী কিতাব দু'টির পরিচয় ঃ অত্র হাদীসটি 'সেহাহ্ সেত্তা' হাদীসের কিতাবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব বুখারী এবং মুসলিম শরীফে স্থান পেয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য এক, দুই ও তিন নম্বর হাদীসে দেখুন।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে পঠিত হাদীসটির প্রাথমিক ধারণা প্রদান করলাম। এখন আপনাদের সামনে হাদীসটির প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করেছি। উল্লেখিত হাদীসে মহানবী (সাঃ) প্রথমেই সত্য কথা বলা এবং সত্যের চর্চা করার সুফল এবং প্রতিদান উল্লেখ করে বলেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ - فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ إِلَى الْبِرِّ
وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ إِلَى الْجَنَّةِ

"তোমরা অবশ্যই সত্য বলবে। কেননা, সত্যবাদিতা অবশ্যই নেকীর দিকে নিয়ে যায় এবং নিশ্চয়ই নেকী জান্নাতে নিয়ে যায়।"

হাদীসের এই অংশে মহানবী (সাঃ) সত্যবাদিতার সুফল এবং উত্তম প্রতিদানের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে বলেছেন, তোমরা অবশ্যই সত্য বলবে। 'সত্য বলা' বলতে সত্যের চর্চা করা অর্থাৎ সত্য কথা বলা, মানুষের নিকট কাজে-কর্মে, চলায়-বলায়, লেন-দেনে সততার পরিচয় দেয়া। যার কারণে মানুষ তাকে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহও ভালো বাসেন।

اَلصِّدْقُ -(আস্‌সিদক) আরবি শব্দের বাংলা অর্থ হলো সত্যবাদিতা। ইসলামী পরিভাষায় اَلصِّدْقُ- এর অর্থ হলো কোনো ঘটনার বাস্তব ও প্রকৃত বর্ণনাকে সিদ্‌ক বা সত্যবাদিতা বলা হয়। আর যে সত্য কথা বলে তাকে বলা হয় صَادِقٌ-(সাদিক) বা সত্যবাদী। সুতরাং যে সত্য কথা বলে সকলেই তাকে বিশ্বাস করে ও ভালোবাসে। সত্যকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকলে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জগতে সফলতা লাভ করা যায়। হাদীসের পরবর্তী অংশে মহানবী (সাঃ) সত্যবাদিতার প্রতিদান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেনঃ

فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ

কেননা, সত্যবাদিতা অবশ্যই পুণ্য বা নেকীর দিকে পরিচালিত করে এবং নেকী বা পুণ্য জান্নাতে নিয়ে যায়।"

হাদীসের এই অংশে রাসূল (সাঃ) সত্যবাদিতার উপকারীতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, সত্যবাদিতা মানুষকে নেক্‌কার বানিয়ে দেয়। আর তার এই নেক কাজ তাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়।

সত্যবাদিতার তাৎপর্য ও উপকারীতা ঃ হাদীসের এই ছোট্ট দু'টি কথার আলোচনা করলে এর ব্যাপক তাৎপর্য এবং উপকারীতা অর্জন করা সম্ভব। প্রিয় ভায়েরা, তাই আমি আপনাদের সামনে সত্যবাদিতার কিছু তাৎপর্য

এবং উপকারীতা আলোচনা করছি।

১. তাকওয়ার অন্যতম গুনাবলী ঃ তাকওয়া বা খোদাভীতির কারণে মানুষের মধ্যে যেসব গুনাবলীর সৃষ্টি হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো সিদ্‌ক বা সত্যবাদিতা। সত্যবাদিতা মানব জীবনের একটি মহৎ গুণ। এর মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থা ও ঘটনা প্রকাশ পায় বলে এর দ্বারা জীবনের মহৎ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। এজন্য মহান আল্লাহ্‌ পাক মুমিনদেরকে আহবান করে বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰادِقِيْنَ

"হে মুমিনেরা! তোমরা আল্লহ্‌কে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও।" (সূরা তওবা-১১৯)

২. সত্যবাদিতা আমলকে সংশোধন করে ঃ মুমিন মুসলমান যদি সত্যবাদী হয় এবং সত্যের চর্চা করে তখন তার পক্ষে কোনো পাপ বা গুনাহ্‌র কাজ করা সম্ভব হয় না। কারণ যখন যেভাবে তাকে অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে তখন তাকে তা স্বীকার করতেই হবে। ফলে তাকে মানুষের কাছে লজ্জিত এবং অপমানিত হতে হবে এবং শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্‌পাক বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো, আর সদা-সর্বদা সত্য কথা বলো। তা হলে তোমাদের আমল বা কাজ-কামগুলো ইস্‌লাহ বা সংশোধিত হয়ে যাবে এবং তোমাদের গুণাহগুলো মাফ করে দেয়া হবে। (আহযাব-৭০-৭১)

সত্যবাদিতার কারণে অন্যান্য আমলগুলোও যে সংশোধিত হয়ে যায় এই সম্পর্কে হাসীসে উল্লেখ রয়েছে;-একবার মহানবী (সাঃ) এর কাছে একজন লোক এসে বললো ঃ "আমি চুরি করি, মিথ্যা বলি, আরও অনেক খারাপ কাজ করি। সবগুলো খারাপ কাজ বাদ দেয়া তো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই আমাকে একটিমাত্র খারাপ কাজ বাদ দেবার জন্য নির্দেশ দিন (হে আল্লাহর রাসূল!) মহানবী (সাঃ) বললেনঃ তাহলে তুমি মিথ্যা বলা ত্যাগ করো। লোকটি বললো, এই কাজটি তো খুবই সহজ। পরে দেখা গেল, কেবলমাত্র মিথ্যা বলা ত্যাগ করার কারণে তার পক্ষে আর কোনো খারাপ কাজ করা সম্ভব হলো না। বরং সকল খারাপ কাজ ত্যাগ করতে বাধ্য হলো।"কেননা খারাপ কাজ করতে গেলেই তাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়।

৩. সিদক বা সত্যবাদিতা গুনাহ্ মাফ করে ঃ উল্লেখিত হাদীসে বলা হয়েছে সত্যবাদিতা মানুষকে নেকীর দিকে নিয়ে যায়। তার কারণ হলো সত্যবাদী সব সময় সত্য কথা বলে, সত্যকে আঁকড়িয়ে থাকে, সত্যের উপর অবিচল এবং মজবুত থাকে, তখন তার দ্বারা নেকীর কাজই হয়। আর গুনাহ্র কাজ তো হয়না বরং তার এই সততা বা সত্যের চর্চার কারণে আল্লাহ্পাক তার অপরাধ বা গুনাহ্গুলোও মাফ করে দেন। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক নিজেই বলেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সদা-সর্বদা সত্য কথা বলো। তাহলে তোমাদের কাজ-কামগুলো সংশোধিত হয়ে যাবে এবং তোমাদের অপরাধ বা গুনাহ্গুলো মাফ করে দেয়া হবে।"

(আহযাব-৭০-৭১)

৪. সত্যবাদিতা মুক্তি দেয় ঃ اَلصِّدْقُ يُنْجِىْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ
"সত্যবাদিতা মুক্তি দেয় এবং মিথ্যাবাদিতা ধ্বংস করে।" সত্যের চর্চা করলে যেমন বিপদ থেকে মুক্তি পায় এবং পাপ থেকে বেঁচে নেকী হাসিল করে, তেমনি অন্যকেও সত্যবাদিতার প্রভাবে অন্যায়ের পথ থেকে ফিরিয়ে আনে। যেমন মুসলিম দার্শনিক আবদুল কাদের জ্বিলানী (রহঃ) এর সততার কারণে নিজে সশস্ত্র ডাকাত দলের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন এবং ডাকাত দলের লোকেরাও তাদের এই অপকর্মের পথ ছেড়ে ভালো মানুষে পরিণত হয়েছিলো। একবার বালক আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) মাদ্রাসায় যাচ্ছিলেন। পথে ডাকাত দলের সম্মুখীন হলেন। ডাকাতেরা তাকে জিজ্ঞেস করে তোমার কাছে কিছু আছে ? বালক জ্বিলানী তার মায়ের নির্দেশ মতো তিনি বলেন! হ্যাঁ আছে। তিনি তাঁর কমরে রাখা স্বর্ণ মুদ্রাগুলো ডাকাতদের দিয়ে দেন। এতে ডাকাতদল আশ্চার্যনীত হয়ে বলে ঃ হে ছেলে! আমাদের কাছে তো কেউ কিছু স্বীকার করে না। তুমি তো স্বীকার করে ফেললে ? প্রতিউত্তরে বালক জিলানী (রহঃ) বললেনঃ আমার আম্মা শিখিয়েছেন **"মিথ্যা কথা বলা মহা পাপ। সদা সত্য কথা বলবে।"** তাই আমি সত্য কথাটি বলেছি। এতে ডাকাতদের সম্মতি ফিরে আসলো, তারা বালক জ্বিলানী (রহঃ) কে তাঁর স্বর্ণের মুদ্রা ফিরিয়ে দিলো এবং নিজেরাও চিরদিনের জন্য ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে সত্যের পথ ধরলো।

৫. সত্যবাদিতা সফলতা দান করে ঃ আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে। তাই তাদের কর্তব্য হলো একে অপরকে সত্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। নিজে যেমন সততার সাথে জীবনযাপন করবে তেমনিভাবে অন্যদেরকেও সততার সাথে জীবন পরিচালনার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَالْعَصْرِ ۞ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۞ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۞

"সময়ের কশম! নিশ্চয়ই সকল মানুষই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করেছে এবং একে অপরকে সত্যের ও ধৈর্য্যের জন্য উপদেশ দিয়েছে।" (সূরা আসর)

৬. সত্যবাদী জান্নাত লাভ করে ঃ উল্লেখিত হাদীসে বলা হয়েছে সত্যবাদীকে নেকীর মাধ্যমে জান্নাতে পৌছিয়ে দেয়। জান্নাত তো আল্লাহ্পাক মানুষের ত্যাগের বিনিময়ে দিয়ে থাকেন। তাই দুনিয়াতে সত্য বলা এবং সত্যের উপর চলা আর অন্যদেরকে সত্যের পথ দেখানো খুব সহজ কাজ নয়। এতে তাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। সত্যের পথে চলা এবং সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে গিয়ে যুগে যুগে নবী রাসূলগণকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, তাঁরা জুলুম-নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা সকল বাধাকে উপেক্ষা করে সত্যের পথে টিকে ছিলেন। তাই যুগে যুগে যারাই এই সথ্যের পথ অবলম্বন করবে এবং সত্যের পথে টিকে থাকবে তাদেরকে আল্লাহ্ পাক এর প্রতিদান হিসেবে জান্নাত দান করবেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক সত্যবাদীদের ব্যাপারে ঘোষণা করবেন ঃ

هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ- لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞

"আজ তো সেই (বিচারের) দিন, যেদিন সত্যবাদীদের সততা উপকার দেবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা

প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। আর এটাই হচ্ছে (সত্যবাদীদের জন্য) বিরাট সাফল্য। (সূরা- মায়িদা-১১৯)

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সত্যবাদিতা সম্পর্কে হাদীসের পরবর্তী অংশে বলেন ঃ

وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدِقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا -

"আর মানুষ যখন সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্য বলতে বলতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন সে (ধীরে ধীরে) আল্লাহ্র খাতায় পরম সত্যবাদী হিসেবে লিখিত হয়ে যায়।"

হাসীদের এই অংশে সত্যবাদীর সত্যের চর্চার কারণে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্যতার কথা বলা হয়েছে। কেননা, যখন মানুষ সত্য কথা বলে, সত্যের চর্চা করে, মিথ্যার আশ্রয় নেয় না তখন সে আল্লাহ্র কাছে সত্যবাদী হিসেবে আখ্যায়িত হয়ে যায় এবং তিনি তাঁর সত্যবাদীর খাতায় তাকে তালিকাভুক্ত করে নেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং তাকে মিথ্যা থেকে হেফাজত করে নেন। প্রকৃত কথা হলো আল্লাহ্র কাছ থেকে সত্যবাদী উপাধি লাভ করা একজন মুমিনের জন্য বিরাট পুরস্কার।

শুধু যে সত্যবাদী আল্লাহ্র কাছেই সত্যবাদী হিসেবে আখ্যায়িত হয় তা নয়, বরং সমাজের মানুষের মনের মধ্যেও সে সত্যবাদী এবং বিশ্বাসী হিসেবে স্থান করে নেয়। সকলেই তাকে বিশ্বাস করে এবং সম্মান করে। যেমন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে নবুওয়াত লাভের আগেই সততার কারণে কাফেরেরাই তাঁকে 'আল-আমীন' বা বিশ্বাসী বলে খেতাব দিয়েছিলো। এমনকি তাঁর সততার কারণে ধর্ম-বর্ণ

নির্বিশেষে সবাই তাঁকে বিশ্বাস করতো এবং তাঁর কাছে তাদের আমানত গচ্ছিত রাখতো।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে হাদীসের প্রথম অংশ সত্যবাদিতার প্রতিফল এবং প্রতিদান সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এখন হাদীসের পরবর্তী অংশ তারই বিপরীত বৈশিষ্ট মিথ্যাবাদীতার কুফল এবং পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করছি। মহানবী (সাঃ) বলেনঃ

وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ-

"সাবধান! অবশ্যই তোমরা মিথ্যা হতে দূরে থাকবে। কেননা মিথ্যা-চার অবশ্যই পাপের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপ বা গুনাহ্ জাহান্নামে নিয়ে যায়।"

সত্যবাদিতার জন্য যেমন মানুষ চরম সফলতা অর্জন এবং প্রতিদান লাভ করে তেমনি মিথ্যাবাদিতা এবং মিথ্যাচারিতা মানুষকে চরম বিফল এবং ধ্বংস করে দেয়। মিথ্যাচারিতা একটা জঘন্য অপরাধ ও নিন্দনীয় এবং নিকৃষ্ট আচরণ। এটা যাবতীয় পাপ ও অপকর্মের কেন্দ্রবিন্দু। আর এই অপকর্মের কারণেই তাকে জাহান্নামে পৌছিয়ে দেয়।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! হাদীসে উল্লেখিত মিথ্যাচারিতার যে পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা যদি আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করি, তা হলো আমরা যা পায় তা হলো ঃ

كِذْبٌ -বা মিথ্যা কি ? মিথ্যাচারিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে মিথ্যা সম্পর্কে জানা দরকার। মিথ্যা হলো প্রকৃত ঘটনা গোপন রেখে বাস্তবতা বিবর্জিত বর্ণনা দেয়াকে মিথ্যা বা মিথ্যাচার বলা হয়।মহানবী (সাঃ) মিথ্যাকে اَلْكِذْبُ اُمُّ الْمَعْصِيَةِ অর্থাৎ **"মিথ্যা সকল পাপ কাজের জননী"** বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর মিথ্যার শেষ পরিণতি

হলো ধ্বংস। এটা মুনাফেকীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মিথ্যাবাদিকে কেউ বিশ্বাস করে না। সবাই তাকে অবিশ্বাস এবং ঘৃণা করে। তাকে সবাই এড়িয়ে চলে এবং বিপদে-আপদে সে কারো সাহায্য-সহযোগীতা পায় না।

মিথ্যার ধরণ ঃ মিথ্যার ধরণ বিভিন্ন। কথায়, কাজে, ইশারা-ইংগিতে, রশিকতায়, স্বাক্ষ্য দানে এমনকি পেটে ক্ষুধা থাকার পরও মিথ্যা কষ্ট স্বীকার করা ইত্যাদির মাধ্যমে মিথ্যাচারিতা করা হয়, যা মানুষ অত্যন্ত সহজ ভাবেই এর আশ্রয় নিয়ে থাকে। এসবের গুরুত্ব মোটেই দেয় না। অহরহ মানুষ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। যেখানে মিথ্যার আশ্রয় নেবার কোনো প্রয়োজন হয় না সেখানেও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। অথচ মানুষ এর পরিণতি সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন। নিম্নে মিথ্যার কয়েকটি ধরণ হাদীসসহ উল্লেখ করা হলো ঃ

(i) হাসাবার জন্য মিথ্যা বলা ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

وَيْلٌ لِّمَنْ يُّحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهٗ وَيْلٌ لَّهٗ-

"ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য যে লোকদেরকে হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে। তার জন্যে রয়েছে ধ্বংস, তার জন্য রয়েছে অকল্যাণ।" (তিরমিজি)।

(ii) মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দেয়া ঃ এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا وَهُوَ لَكَ بِهٖ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ بِهٖ كَاذِبٌ

"সব চেয়ে বড় খেয়ানত হলো তুমি তোমার ভায়ের কাছে এমন কথা বলবে, যা সে সত্য বলে মনে করবে। অথচ তাকে মিথ্যা বলছো। (আবু দাউদ)

(iii) রশিকতা করে মিথ্যা বলা এবং সন্তানকে মিথ্যা ওয়াদা দেয়া ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ

لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ فِىْ جِدٍّ وَّلَا هَزْلٍ وَلَا اَنْ يَّعِدَ اَحَدُكُمْ وَلَدَهٗ شَيْئًا ثُمَّ لَا يُنْجِزُ لَهٗ

"রশিকতা করে মিথ্যা বলা এবং অহংকার প্রদর্শন করা কোনো অবস্থাতেই ঠিক নয়। আর তোমাদের সন্তানদের সাথে এমন কোনো ওয়াদা করবে না যা তোমরা পূরণ করতে পারবে না।" (আদাবুল মুফরাত)

(iv) পেটে ক্ষুধা সত্ত্বেও ভদ্রতা দেখাতে গিয়ে মিথ্যা বলা ঃ এ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেনঃ

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ زَفَفْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهٖ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ اَخْرَجَ عُسًّا مِّنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ مِنْهُ اِمْرَاَتُهٗ فَقَالَتْ لَا اَشْتَهِيْهِ فَقَالَ لَا تَجْمَعِىْ جُوْعًا وَكِذْبًا

"হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কোনো একজন স্ত্রীকে বধু সাজিয়ে তাঁর কাছে বাসর যাপনে পাঠালাম। আমরা (বধু নিয়ে) তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি এক পেয়ালা দুধ বের করে তা থেকে নিজে পান করলেন। অতঃপর তা এগিয়ে দিলেন নব স্ত্রীর দিকে। তিনি (বধু) বললেন ঃ আমার খেতে ইচ্ছে করে না। তখন রাসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ ক্ষুধা এবং মিথ্যাকে একত্রিত করো না। অর্থাৎ ক্ষুধা থাকার

পরও এরূপ বলা মিথ্যা হয়ে যায়। (মুজামুস্-সগীর)

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! বর্তমানে এটা একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে যে, বন্ধু-বান্ধবের পক্ষ থেকে কোনো আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হলে, ক্ষুধা বা ইচ্ছা থাকার পরও ভদ্রতা দেখাতে গিয়ে বলে, "এখন খাবনা" "খাবার প্রয়োজন নেই"। "খেতে ইচ্ছে করেনা" কিংবা "ক্ষিধে নেই" ইত্যাদি কথা বলে খাবার দিতে নিষেধ করা হয়। এ হাদীসে এরূপ মিথ্যা কষ্ট সহ্য করতে নিষেধ করা হয়েছে।

প্রিয় ভায়েরা, মিথ্যা কথা বা মিথ্যা কাজের ধরণ বিভিন্ন প্রকারের যা বর্ণনা করলে দারসের কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাবে। সুতরাং বলা যায়, যা প্রকৃত বা বাস্তব নয় তা বলা এবং যা প্রকৃত এবং বাস্তব তা গোপন করা উভয়টিই মিথ্যার মধ্যে গণ্য হবে। যার পরিণতি দুনিয়া এবং আখেরাতে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও ভয়াবহ।

আলোচ্য হাদীসে মিথ্যা পাপের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপ জাহান্নামে নিয়ে যায় এই বাক্যটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দুনিয়া এবং আখেরাতে যে ভয়াবহ পরিণতি রয়েছে তার কয়েকটি বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. কিযব বা মিথ্যা সকল পাপাচারের মূল ঃ সকল পাপাচারের মূল হলো কিযব বা মিথ্যা। মিথ্যার আশ্রয়ে মানুষ অপরাধ করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। তাই সকল পাপ কাজের সাথে মিথ্যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তা রয়েছে। এই সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

اَلْكِذْبُ اُمُّ الذُّنُوْبِ **"মিথ্যা সকল পাপ কাজের জননী বা মূল"**

২. কিযব জঘন্য অপরাধ ঃ মিথ্যা বলা বা স্বাক্ষ্য দেয়া কবীরা গুনাহ। মিথ্যা বলায় আল্লাহ্ যতটা অসন্তুষ্ট হন অনুরূপ অসন্তুষ্ট অন্য কোনা কাজে হন না। তাই আল্লাহ্ তাআলা মিথ্যা বলা নিষেধ করে বলেন ঃ

وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

"তোমরা মিথ্যা বলা হতে দূরে থাকো।" (সূরা হজ্ব)

৩. মিথ্যা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য ঃ মুনাফিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মিথ্যা বলা। মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ....

'মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য তিনটি, তার মধ্যে প্রথমটি হলো যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে.....।' আর যাদের মধ্যে মুনাফেকী থাকবে তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

"নিশ্চয় মুনাফিকরা দোযখের সব চেয়ে নীচ স্তরে অবস্থান করবে।" (সূরা নিসা-১৪৫)

৪.কিয্‌বের পরিণতি হলো ধ্বংস ঃ মিথ্যাবাদীকে কেউই বিশ্বাস করে না এবং তাকে কেউ সাহায্যও করে না। সবাই তাকে ঘৃণা করে। ফলে তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে। এই সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

اَلْكِذْبُ يُهْلِكُ **"মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে"**। মিথ্যুক রাখাল বালকের পরিণতি আমাদের সবার জানা আছে। বার বার মিথ্যা বলে প্রতারিত করার কারণে সত্যিই যেদিন বাঘ এসে হাজির হলো তখন আর কেউ তার কথায় বিশ্বাস করলো না এবং সাহায্যের জন্য এগিয়েও আসল না। ফলে সে বাঘের আক্রমণে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেল।

৫. কিযব এক প্রকারের জুলুম ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা, ইসলামের বিধানকে অস্বীকার করা, নিজের কথাকে আল্লাহ্ বা রাসূলের কথা বলে চালিয়ে দেয়া জঘন্য অপরাধ এবং জুলুমের শামিল। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ

يُدْعٰى اِلَى الْاِسْلَامِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ۔

"যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে দাওয়াত পাবার পরেও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে ? আর আল্লাহ্ জালেমদেরকে পথ দেখান না। (সূরা-সফ্‌ফ-৭)

৬. মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেয়ার পরিণতি ঃ যারা মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেয় তারা চারটি বড় বড় গুনাহে জড়িত হয়।

(i) সে মিথ্যা ও মনগড়া কথা বলে।

(ii) সে যার বিরুদ্ধে মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেয় তার উপর যুলুম করে। কারণ সে এই কাজের দ্বারা তার জান-মাল বা সম্মানের ক্ষতি করে।

(iii) সে যার পক্ষে স্বাক্ষ্য দেয় তার উপরও যুলুম করে। কেননা সে তার জন্য হারাম সম্পদের ব্যবস্থা করে দেয়।

(iv) সে মিথ্যা স্বাক্ষ্যের দ্বারা একটা হারাম সম্পদ ঐ ব্যক্তির জীবন বা সম্মানের উপর অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ বানিয়ে দেয়।

৭. মিথ্যাবাদী সকলের কাছে ঘৃণার পাত্রঃ মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। সকলেই তাকে ঘৃণা করে। এমনকি ফেরেশতারাও তাকে ঘৃণা করে দূরে সরে যায়। এ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

اِذَا كَذِبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدُوْا عَنْهُ الْمَلَكُ مَيْلًا مِنْ نَتَنِ مَاجَاءَ بِهٖ

"কেউ যখন মিথ্যা বলে তখন তার দুর্গন্ধের কারণে আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা পর্যন্ত (ঘৃণায়) তার থেকে এক মাইল দূরে সরে যায়।"

অতঃপর দারসের জন্য পঠিত হাদীসের শেষ অংশে রাসূলে কারীম (সাঃ) বলেন ঃ

وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتّٰى

يُكْتَبُ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا

"আর কোনো ব্যক্তি যখন সর্বদা মিথ্যা কথা বলতে থাকে এবং মিথ্যাচারিতায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন সে মহান আল্লাহ্‌র খাতায় চরম মিথ্যাবাদী বলে লিখিত হয়ে যায়।"

মানুষ যখন মিথ্যাচারে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন তার এটা খাসলাতে পরিণত হয়ে যায়। সে কথায়-কথায়, কারণে-অকারণে মিথ্যা বলে। আর তার এই সদা-সর্বদা মিথ্যাচারিতার জন্য সে মানুষের কাছে মিথ্যাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত হয়ে যায়। তাকে কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। মাঝে মধ্যে দু'একটা সত্য কথা বললেও মানুষ তার মিথ্যা বলা অভ্যাসের কারণে মনে করে যে সে মিথ্যাই বলেছে। মোটেই তার প্রতি আস্থা আনতে পারে না। সুতরাং সে সামাজিকভাবে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অনুরূপ ভাবে আল্লাহ্‌র দফতরেও সে মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখিত হয়ে যায়। এটা মানুষের জন্য বিরাট ক্ষতি এবং বিফলতা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে হাদীসটির যে ব্যাখ্যা পেশ করলাম তাতে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষণীয় দিক রয়েছে তা হলো ঃ

● সদা-সর্বদা সত্য কথা বলতে হবে। কেননা সত্যবাদী সমাজের মানুষের কাছে সম্মানের পাত্র হয় এবং আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদা লাভ করে। সত্য বলতে বলতে যখন সে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন সে সামাজিক ভাবে যেমন সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে, তেমনি সে আল্লাহ্‌র দফতরেও সত্যবাদী হিসেবে লিখিত হয়ে যায়। যা একজন মুমিনের জন্য বিরাট পুরস্কার।

● নেকী বা পুণ্যের মাধ্যম হলো সত্যবাদিতা। সত্য কথা, কাজ বা

আচরণের মাধ্যমে একজন মুমিন পুণ্য বা নেকী অর্জন করে থাকে। সকল ভালো বা কল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমই হলো সত্যবাদিতা। আর পূণ্য বা নেকী জান্নাতে নিয়ে যায়। সুতরাং নিয়ামতে ভরা জান্নাত লাভ করার জন্যই সদা-সর্বদা সত্য বা হক কথা বলতে হবে।

● সকল পাপ কাজের উৎস হলো মিথ্যাচারিতা। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় আচরণ। যাবতীয় পাপ ও অপকর্মের কেন্দ্রবিন্দু হলো মিথ্যাবাদিতা। আর অপকর্ম ও পাপ জাহান্নামে নিয়ে যায়। সুতরাং জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্যই মিথ্যা পরিহার করে চলতে হবে।

● সমাজে এবং আল্লাহ্‌র কাছে সত্যবাদিতার যেমন সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে তেমনি তার বিপরীতে মিথ্যাবাদিতারও সমাজে এবং আল্লাহ্‌র কাছে অসম্মান এবং অমর্যাদা রয়েছে। সুতরাং সকল প্রকার মিথ্যা পরিহার করে সত্যবাদিতার গুণে গুণান্বিত হতে হবে।

আহবান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে হাদীসের যে দারস পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ক্রুটি হয়ে যায় তার জন্য মহান আল্লা্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর হাদীস থেকে আমরা যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে হাদিসটির দারস শেষ করছি।'অয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।'

নয়

হাশরের মাঠে আল্লাহ্‌র ছায়ায় যে সব মুমিন আশ্রয় পাবে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ: اِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى، وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ،اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَاَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ، فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ-(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

সরল অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ জনাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ তাআলা সেই (হাশরের) কঠিন দিনে তাঁর (রহমতের) ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়ায় থাকবে না। তারা হচ্ছেঃ (১) ন্যায় বিচারক বাদশাহ্ বা শাসক। (২) ঐ যুবক যে আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত তথা তাঁর দাসত্ব আনুগত্যের মাঝে বড় হয়েছে। (৩) ঐ লোক যার অন্তর মসজিদের সাথে টাঙ্গানো থাকে। (৪) ঐ দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহ্‌রই (সন্তষ্টির) জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে। আবার আল্লাহ্‌র (সন্তষ্টির) জন্য তারা মিলিত হয় এবং আল্লাহ্‌র (সন্তষ্টির) জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (৫) ঐ লোক যাকে অভিজাত বংশীয় কোনো সুন্দরী রমণী (কুকর্মের) জন্যে ডাকে। জবাবে সে বলে, আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি। (৬) ঐ লোক যে গোপনে দান-খয়রাত করে, এমনকি তার ডান হাত কি দান করলো বাম হাত তা টের পায় না এবং (৭) ঐ লোক যে একাকী গোপনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে দু'চোখের অশ্রু ঝরায়। (বুখারী মুসলিম)

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ عَنْ--থেকে বা হতে। قَالَ--বলা বা বলেন। سَبْعَةٌ--সাত। يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ--তারা আল্লাহ্‌র ছায়ায় আশ্রয় লাভ করবে। فِىْ--মধ্যে। يَوْمٌ--দিন (হাশরের দিন)। لَاظِلَّ--ছায়া থাকবে না। اِلَّا ظِلُّهُ--তাঁর (আল্লার)ছায়া ছাড়া। اِمَامٌ--বাদশাহ বা শাসক।। عَادِلٌ--ন্যায় বিচারক। وَ--এবং। شَابٌّ--যুবক نَشَأَ--অতিবাহিত করেছে বা কাটিয়েছে। عِبَادَةِ اللّٰهِ--আল্লাহ্‌র এবাদতে। رَجُلٌ--ব্যক্তি বা লোক। قَلْبُهُ--তার অন্তর। مُعَلَّقٌ--টাঙ্গানো। مَسَاجِدِ--মসজিদ সমূহ। رَجُلَانِ--দুই ব্যক্তি বা লোক। تَحَابَّا-- পরস্পরকে ভালোবাসে فِى اللّٰهِ--আল্লাহ্‌র জন্য। اِجْتَمَعَا--একত্রিত বা মিলিত হয়। عَلَيْهِ --তাঁর উপরে বা জন্যে। تَفَرَّقَا--পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা পৃথক হয়ে যায়। دَعَتْهُ--তাকে আহবান করে বা ডাকে। اِمْرَاةٌ--নারী বা রমণী। ذَاتُ مَنْصِبٍ--অভিজাত বংশীয়। جَمَالٍ--সুন্দরী। فَقَالَ--অতঃপর সে বলে। اِنِّىْ--নিশ্চয় আমি। اَخَافُ اللّٰهَ--আল্লাহ্‌কে ভয় করি। تَصَدَّقَ--দান করে। صَدَقَةً--দান-সাদকা। فَاَخْفَاهَا--অতঃপর তা এমন গোপনে করে। حَتّٰى-এমনকি। لَا تَعْلَمَ--জানে না। شِمَالُهُ --তার ডান হাত। مَا --কি। تُنْفِقُ--সে দান করলো। يَمِيْنُهُ--তার বাম হাত। ذَكَرَ اللّٰهَ--আল্লাহ্‌র যিকির বা স্মরণ। خَالِيًا--নিভৃতে বা গোপনে। فَفَاضَتْ--অতঃপর অশ্রু ঝরায়। عَيْنَاهُ--তার দু'চোখ।

সম্বোধন ঃ সম্মানিত ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভাই ও বোনেরা! আমি আপনাদের সামনে হাশরের ময়দানে কঠিন মুহূর্তে যে সাত শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ্‌র রহমতের ছায়ার নীচে আশ্রয় লাভ করবে সে সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহাবী এবং বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এর বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসটি পাঠ এবং অনুবাদ করেছি। আল্লাহ্‌ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরার তাওফীক দান করেন।

রাবীর পরিচয় ঃ অত্র হাদীসের রাবী হযরত আবু হুরাইরার পরিচয় পাঁচ নম্বর হাদীসে দেখুন।

বর্ণিত হাদীসের কেতাব দু'টির পরিচয় ঃ মুত্তাফাকুন আলাইহ্ অর্থাৎ বুখারী এবং মুসলিম শরীফের পরিচয় এক নম্বর হাদীসে দেখুন।

হাদীসটি বর্ণনার সময়কাল ঃ হাদীসটি বর্ণনার সময়কাল নির্দিষ্ট ভাবে বলা না গেলেও বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মাদানী জীবনে বর্ণনা করেছেন। কেননা, হাদীসে ন্যায় বিচারক শাসক এবং মসজিদে নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে যা মাদানী জীবনের জন্য প্রযোজ্য ছিলো, মাক্কী জীবনে নয়। তার পরেও আল্লাহ্ পাকই বেশী জানেন।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/ বোনেরা, এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে হাদীসটির প্রাথমিক ধারণা তুলে ধরলাম। এখন আমি হাদীসটির ব্যাখ্যা পেশ করছি। হাদীসের প্রথমে মহানবী (সাঃ) হাশরের ময়দানে আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ ছায়ার কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ

"সাত শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ্ তাআলা সেই (হাশরের) কঠিন দিনে তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়ায় থাকবেনা।"

হাদীসের প্রথমেই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দুনিয়ার জীবনে যারা দুনিয়াদারীতে ডুবে আল্লাহ্কে ভুলে না গিয়ে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্কে ভয় করে জীবনের প্রতিটি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, যা ছিলো অত্যন্ত কঠিন। এমন বিশেষ সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ পাক বিচারের দিন হাশরের ময়দানে কঠিন সময় তাঁর বিশেষ ছায়ার নীচে আশ্রয় দান করবেন। সেই সব বিশেষ মর্যাদার অধিকারী কারা- হাদীসের পরবর্তী অংশে তা ধারাবাহিক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তার আগে আমাদের জানা দরকার হাশরের ময়দানের অবস্থা।

হাশর কোথায় হবে ঃ ? কেয়ামতের দু'টি অবস্থার মধ্যে প্রথম অবস্থায় ইসরাফীল (আঃ) এর শিংগার ধ্বনিতে পৃথিবীর সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে অতঃপর পরবর্তী ধ্বনীতে আবার সমস্ত মানুষ জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে

জমায়েত হবে। আর হাশরের মাঠ হবে দুনিয়ার এই যমীন। এখানেই আদি থেকে অন্তঃ পর্যন্ত সকল মানুষের বিচার করা হবে। পৃথিবীর তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ স্থল। স্থল ভাগে পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষার জন্য পেরেকের মত গেড়ে রাখা সমস্ত পাহাড় পর্বত কেয়ামতের বিভিশিকায় ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সমুদ্রের পানি আগুণ লেগে শুকিয়ে গিয়ে পৃথিবী একটি সমতল ভূমিতে রূপ নিবে। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا ۙ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۙ لَّاتَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ۙ

"তারা আমাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে ? অতএব, (হে রাসূল) আপনি (তাদেরকে) বলুনঃ আমার রব পাহাড় সমূহকে (কেয়ামতের মাধ্যমে) উপড়িয়ে ফেলে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন। অতঃপর পৃথিবীকে মসৃণ সমতল ভূমি করে ছাড়বেন। আর তাতে তুমি কোথাও উঁচু নীচু দেখবে না।" (সূরা ত্ব-হা-১০৫-১০৭) আল্লাহ্ পাক সূরা কাহাফের ৪৭ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেন ঃ **وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ۙ**

"যেদিন (কেয়ামতের দিন) আমি পর্বতগুলোকে পরিচালনা করবো এবং আপনি (হে রাসূল) পৃথিবীকে দেখবেন একটা খোলা মাঠ এবং আমি মানুষকে (সেখানে) একত্রিত করবো অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়বো না।" সুতরাং আল্লাহ্‌র সামনে চূড়ান্ত ভাবে বিচারের জন্য কেয়ামতের দিন মানুষ সমবেত হবে দুনিয়ার এই যমীনেই। অতএব হাশরের ময়দান হবে পৃথিবীর এই যমীন।

হাশরের দিনের অবস্থা কেমন হবে ঃ? কেয়ামত মানেই হলো পুনরুত্থান। অর্থাৎ ইসরাফীল (আঃ) এর শিংগার শেষ ধ্বনীতে পৃথিবী সৃষ্টি থেকে শুরু করে কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আগমন করেছিলো সবাই সেদিন পুনরায় জীবন লাভ করে চূড়ান্ত ফায়সালার জন্য হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। সেই দিন হবে অত্যন্ত ভয়াবহ যা কুরআন এবং হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। কেয়ামতের দিন হবে

কাফের এবং গোনাহ্গারদের জন্য অত্যন্ত দীর্ঘ এবং মুমিনদের জন্য হবে সংক্ষিপ্ত।

সেদিনের এক একটা দিন হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। আর সূর্য মাথার উপরে এসে হাজির হবে। তার অসংখ্য মুখ হবে। সূর্যের এই উত্তাপে হাশরের ময়দানে সমবেত মানুষের মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। নিজের ঘামের পানিতে হাবুডুবু খাবে। কেউ সাঁতার কাটতে থাকবে। কারো গলা পরিমাণ হবে, আবার কেউ হাঁটু পরিমাণ ঘামের পাটিতে অবস্থান করবে। এই অবস্থা হবে দুনিয়ার আ'মলের ভিত্তিতে। সেদিন সূর্যের তাপ চারিদিকে বিরাজ করবে। কোনো গাছ-পালা থাকবে না। এমনকি সামান্য পরিমাণ কোনো ছায়াও থাকবে না। এমনি এক কঠিন দিনে আল্লাহ্ পাক দুনিয়ার জীবনে সাত শ্রেণীর বিশেষ আ'মল ধারী ব্যক্তিদের বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন। যা হাদীসের পরবর্তী অংশে ধারাবাহিক ভাবে বর্ণনা করা হলো ঃ

প্রথম শ্রেণী ঃ اِمَامٌ عَادِلٌ "ন্যায় বিচারক শাসক"। বিচারের দিন হাশরের সেই কঠিন ময়দানে যারা আল্লাহ্র বিশেষ ছায়ায় আশ্রয় লাভ করবে তাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা হলেন 'ন্যায় বিচারক শাসক'।

বিচারক তারাই হন যাদের হাতে ক্ষমতা এবং এখতিয়ার থাকে। যারা কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারেন আবার নাও দিতে পারেন। দুনিয়াতে আমরা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর ব্যক্তিদের কাছে ক্ষমতা লক্ষ্য করি। (ক) বাদশাহ বা রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ শাসকগণ। যারা নাগরিকদের পরিচালনা করেন। (খ) বিচারকগণ। যারা আদালতে বিচার করেন। (গ) দলীয় নেতা। যারা দলের অধিনস্থদের পরিচালনা করেন। অর্থাৎ বলা যায়, যখনই তাদের সামনে বিচারযোগ্য কোনো বিষয় এসে হাজির হয়, তখন তারা অত্যন্ত নিরপেক্ষ ভাবে "হক্কুল্লাহ" আল্লাহ্র অধিকার এবং "হক্কুল ইবাদ" তথা বান্দার অধিকার রক্ষার মাধ্যমে শরীয়ত মোতাবেক ফায়সালা করেন। এই কাজটি অত্যন্ত কঠিনও বটে। আর এই কঠিন কাজের জন্যই তো আল্লাহ্ পাক কঠিন সময় বিশেষ মর্যাদা দান করবেন।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আল্লাহ্ পাক 'হদ' প্রয়োগের সময় নির্দেশ দিয়ে বলেনঃ "তোমরা যখন 'হদ' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সীমা লঙ্ঘন কারীদের শাস্তি প্রয়োগ করবে তখন যেন তোমাদের অন্তরে দয়ার উদ্রেগ না হয়।" তাই তো দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরে ফারুক (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালে তাঁরই এক সন্তানকে মদ পান করার অপরাধে নিজে ৮০ বেত মারার সময় অত্যন্ত কঠিন এবং ভয়ঙ্কর ছিলেন। আবার যখন তিনি বাড়ীতে ফিরে যান তখন তারই জন্য আবার কাঁদছিলেন। সাহাবারা প্রশ্ন করেন, হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি যখন আপনার ছেলেকে বেত্রাঘাত করছিলেন তখন তো আপনাকে অত্যন্ত কঠিন এবং ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল এখন আবার সেই ছেলের জন্য কাঁদছেন কেন ? প্রতিউত্তরে তিনি বলেছি-লেন ঃ দেখ! আমি যখন বেত্রাঘাত করছিলাম তখন শাসক হিসেবে করছিলাম, আর এখন কাঁদছি পিতা হিসেবে। আসলে এটাইতো হলো-ইমামুল আ'দেলুনের ভূমিকা।

ইসলামী আদালতে রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, বংশ গৌরব, বর্ণ, গোত্রের কোনো পার্থক্য নেই। । তাই তো মহানবী (সাঃ) এর মক্কা বিজয়ের পর একজন কুরাইশ বংশের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে চুরির অপরাধে হাত কাটা হতে রক্ষা পাইনি। তাকে কন্‌সিডার করার জন্য রাসূল (সাঃ)কে অনুরোধ করা হলে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত ভরে বলেছিলেন, "আমার সবচেয়ে প্রিয় মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করতো তাহলেও আমি এই অপরাধের জন্য তার হাত কাটতে দ্বিধা করতাম না।"

ইসলামী আদালতে বিচারকের সামনে উপস্থিত হবার জন্য রাজা-প্রজার বাচ-বিচার করা হয় না। হযরত আলী (রাঃ) এর খেলাফতকালে নিজে তিনি তার চুরি হয়ে যাওয়া ঢাল এর জন্য আদালতে এক ইহুদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন। সেই মামলায় খলিফা এবং ইহুদীকে হাজির হতে বিচারক নির্দেশ দিলে হযরত আলী (রাঃ) তার ছেলে এবং বাড়ির চাকরকে নিয়ে হাজির হলেন। বিচারক হযরত আলী (রাঃ) কে তার পক্ষে স্বাক্ষ্য প্রদান করতে বললে তিনি তাঁর ছেলে এবং চাকরকে স্বাক্ষী হিসেবে পেশ করলেন। বিচারক এতে আপত্তি জানিয়ে বললেন যে, ইসলামী শরীয়তে কোনো আত্মীয়-স্বজন স্বাক্ষী হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই তিনি রায় ঘোষণা করেন, ঢাল হলো ইহুদীর। ইহুদী ইসলামের এই

মহানুভাবতা দেখে সে নিজে ঢাল চুরির কথা স্বীকার করলো এবং কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল।

সুতরাং দুনিয়াতে যে সমস্ত বিচারক আল্লাহ্‌কে হাজির নাজির জেনে ন্যায়গত ভাবে মানুষের কোনো ভয় বা দুর্বলতাকে স্থান না দিয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিচার ফায়সালা করেন। এই সমস্ত ন্যায় বিচারকদেরকে আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিন হাশরের উত্তপ্ত কঠিন ময়দানে তাঁরই কুদরতি বিশেষ ছায়ার নীচে আশ্রয়দান করবেন।

প্রিয় ভায়েরা / বোনেরা! আজকে কি আমাদের দেশে শাসক এবং বিচারকগণ এভাবে বিচার ফায়সালা করে থাকেন ? আমাদের বিচার ব্যবস্থায় কি ইসলামী বিচার ব্যবস্থা চালু আছে ? কোনোটাই নেই। যার কারণেই তো এতো অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তাহীনতা, আস্থাহীনতা, খুন-খারাবী, সন্ত্রাস, রাহাজানি, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা অভিযোগ, মদ, তাড়ি, জুয়া, অশ্লীলতা এবং বেহায়াপনায় গোটা সমাজ ছেয়ে গেছে। তাই তো ইমামুন আ'দেলুন' হতে হলে যেমন ইসলামী সমাজ এবং শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন, তেমনি সৎ, খোদাভীরু, নিরপেক্ষ শাসক এবং বিচারকেরও প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটাতে হলে সমাজ, রাষ্ট্র ও বিচার ব্যবস্থায় আল কুরআনকে সংবিধান এবং আইনের কেতাব হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ وَشَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى

"ঐ যুবক যে আল্লাহ তাআলার দাসত্ব আনুগত্যের মাঝে বড় হয়েছে"।

মানুষের জীবনে পাঁচটি পর্যায় বা কাল অতিক্রম করতে হয়। যেমনঃ (১) শিশুকাল, (২) কৈশর কাল, (৩) যৌবন কাল, (৪) পৌঢ় কাল এবং (৫) বৃদ্ধ কাল।

এই পাঁচটি কালের বা পর্যায়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ সময়কাল হলো যৌবন কাল। মানুষের মধ্যে যৌবন কালটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় যে, কেয়ামতের দিন আদম সন্তান তথা মানুষ এক পাও নড়াতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা

করা হবে। তার মধ্যে একটি হলো ঃ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا بْلَاهُ

"সে তার যৌবনের শক্তি সামর্থ কোন্ কাজে ব্যয়-ব্যবহার করেছে ?" এই সময় একজন যুবক তার যৌবনের তাড়নায় সহজে অন্যায় এবং পাপের পথে ধাবিত হয়ে যায়। এই বয়সটি হচ্ছে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। যৌবনের উদ্দিপনায় সে একটি সমাজ গড়তে পারে আবার ভাঙ্গতেও পারে। তখন সে থাকে ড্যামকেয়ার। সে কাউকেউ পরওয়া করেনা। মানুষে চির শত্রু শয়তানও এই সময় থাকে তার পেছনে তৎপর। দুনিয়ার লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাস তাকে হাত ছানি দিয়ে ডাকে। এমতাবস্থায় এই কঠিন ক্ষণে যদি কোনো যুবক তার যৌবন কালকে আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে ন্যায় এবং নেকীর পথে পরিচালিত করে এবং শয়তানের ওয়াশ-ওয়াশাকে উপেক্ষা করে আল্লাহ্‌র এবাদত বন্দেগীতে অতিবাহিত করে নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান রূপে গড়ে তোলে, আর আল্লাহ্‌র পথে আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েমের জন্য নিজের জীবনকে আত্মনিয়োগ করে, তাহলে আল্লাহ পাক উক্ত যুবকের এই স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ বয়সের বিশেষ ভূমিকার জন্য খুশি হয়ে কেয়ামতের সেই কঠিন দিনে হাশরের ময়দানে তাঁর রহমতের ছায়ার নীচে তাকে আশ্রয় দান করবেন।

তৃতীয় শ্রেণী ঃ وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ

"ঐ লোক যার অন্তর মসজিদের সাথে টাঙ্গানো থাকে।" কেয়ামতের দিন হাশরের সেই কঠিন ময়দানে আল্লাহ্‌র কুদরাতি ছায়ায় আশ্রয় প্রাপ্ত তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত লোক হলো, যার দেল বা অন্তর সবসময় মসজিদের সাথে টাঙ্গানো থাকে। অর্থাৎ এক নামায পড়ে এসে আবার পরবর্তী ওয়াক্তের নামায পড়ার জন্য মানসিক ভাবে উদগ্রীব থাকে। মসজিদে এক ওয়াক্তের নামায পড়ে এসে সে দুনিয়াদারীতে ডুবে গিয়ে পরবর্তী নামায আদায় করার কথা মোটেই ভুলে যায় না। সে কান খাড়া করে থাকে কখন পরবর্তী নামাযের আজান হবে। যে প্রকৃত নামাযি সে কখনও নামাযের ব্যাপারে মোটেই গাফেল থাকে না। কেননা, আল্লাহ্ পাক সূরা মাউন-এ গাফেল নামাজিদের ব্যাপারে কঠিন পরিণতির কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ

"ঐ সমস্ত নামাজিদের জন্য ধ্বংস, যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে গাফেল বা উদাসীন।"

সুতরাং যারা প্রকৃত মুমিন এবং নামাজি তারা পাঁচ ওয়াক্তের নামায মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে আদায় করে। আর এ সমস্ত নামাজীদেরকে নবী পাক (সাঃ) মুমিন বলে উল্লেখ করে বলেন ঃ

اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهٗ بِالْاِيْمَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (تِرْمِذِىْ)

"যখন কাউকেও নিয়মিত ভাবে মসজিদে হাজির হতে দেখবে তখন তোমরা তার মুমিন হওয়ার সাক্ষ্য দেবে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র মসজিদের আবাদ করে সে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে।" (তিরমিজী)

সুতরাং মুমিন ব্যক্তির নিদর্শন হলো নিয়মিত জামায়াতের সাথে নামায আদায় করা। অতএব, যখনই কোনো ব্যক্তি জামায়াতের সাথে নামায আদায় করার জন্য উদগ্রীব থাকে তখন স্বাভাবিক ভাবেই তার মন সব সময় মসজিদের সাথে লেগে থাকে। আর যে ব্যক্তি এই ধরনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে আল্লাহ্ তাআলাও তার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য কেয়ামতের দিন হাশরের কঠিন ময়দানে তাঁর বিশেষ ছায়ার নীচে আশ্রয় দান করবেন।

চতুর্থ শ্রেণী ঃ

وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ-

"ঐ দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহ্রই (সন্তুষ্টির) জন্য একে অপরকে ভালোবাসে। আবার আল্লাহ্রই (সন্তুষ্টির) জন্য তারা একত্রিত হয় এবং আল্লাহ্রই (সন্তুষ্টির) জন্য একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।"

আল্লাহ্র রহমতের ছায়ায় আশ্রয় লাভকারী চতুর্থ শ্রেণীর লোক হলো যাদের ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহ্র রাজি-খুশির জন্য। যাদের এই

ভালোবাসা দুনিয়ার কোনো স্বার্থের জন্য নয়। অন্য হাদীসে মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্‌র জন্যই ভালোবাসাকে পূর্ণ মুমিনের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ -

"যে আল্লাহ্‌র জন্যই কাউকে ভালোবাসলো এবং আল্লাহ্‌র জন্যই ভালোবাসা ত্যাগ করলো, আর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই কাউকে দান করলো এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দান করা বন্ধ করে দিলো, সে তার ঈমানকে পূর্ণ করলো।" (আবু দাউদ) সুতরাং দু'জন মুমিনের বন্ধুত্ব বা ভালোবাসা হবে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাকে রাজি-খুশির জন্য। যদি দেখা যায় যে, একে ভালোবাসলে বা বন্ধুত্ব করলে আল্লাহ্ খুশী হবেন তাহলে তার সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলবে। আর যদি দেখা যায় যে, এতে আল্লাহ্ বেজার হবেন তাহলে তার সাথে আর বন্ধুত্তালী গড়ে উঠবে না। অর্থাৎ বন্ধুত্তালী বা ভালোবাসা গড়ে উঠবে একমাত্র দ্বীনের খাতিরে। যার মধ্যে দ্বীন নেই তার সাথে দুনিয়ায় চলার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই সম্পর্ক ছাড়া অতিরিক্ত কোনো মহব্বত বা খাতীর গড়ে উঠবে না। অর্থাৎ অন্তরের টান বা মহব্বত আদর্শিক কারণেই হবে। যারা এ ধরনের ভূমিকা রাখে তাদের আখেরাতে বিশেষ মর্যাদার কথা উল্লেখ করে রাসূল (সাঃ) হাদীসে কুদসীতে বলেন ঃ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: اَلْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِىْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِّنْ نُوْرٍ يَغْبِطُوْهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ -

"আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ যারা আমার শ্রেষ্ঠত্বের খাতিরে একে অপরকে ভালোবাসে তাদের জন্যে আখিরাতে নূরের মেম্বার (চেয়ার) তৈরী করা হবে যা দেখে নবী ও শহীদেরা তাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন"। (তিরমিযি) তারা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তাআলার জন্যই ভালো-বাসে না। বরং তারা একত্রিত হয় বা মিলিত হয় আল্লাহ্‌র খাতিরে আবার আল্লাহ্‌র খাতিরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ এই গুণের অধিকারী

মুমিনেরা আল্লাহ্‌র দ্বীনের দলে একত্রিত হয়। কিন্তু যদি কেউ দ্বীনি দল ত্যাগ করে তাহলে সেই কারণে সে তাকেও ত্যাগ করে। কোনো বন্ধু দ্বীনি দল ত্যাগ করে চলে গেলে সেও সেই দল ত্যাগ করে বন্ধুর সাথে চলে যায় না। মোট কথা তাদের দু'জনের চলা-ফেরা, উঠা-বসা, মেলা-মেশা, দেখা করা না করা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তাআলার খাতিরেই হয়ে থাকে। দুনিয়ার কোনো খাতিরে নয়। যারা একাজ করতে পারে তারা আল্লাহ্‌র ভালোবাসা পেয়ে থাকে। এ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: وَجَبَتْ مُحَبَّتِىْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىْ الْمُتَجَالِسِيْنَ فِىْ الْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ (مَالِكْ)

"আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ যারা আমার জন্যে একে অপরকে ভালো-বাসে, আমার জন্যই এক জায়গায় বসে, আবার আমার জন্যে একে অপরে দেখা করতে যায় এবং আমার জন্যেই পরস্পরে অর্থ ব্যয় করে তাদের জন্যে আমার ভালোবাসা অবধারিত।" (মুয়াতা ইমাম মালেক)

দুনিয়ার জীবনে এই কাজ করা অত্যন্ত কঠিন। অনেকেই এ কাজটি সামাজিকতা এবং স্বার্থের জন্যে করতে পারে না। আর যারাই এই কঠিন কাজটি দুনিয়াতে করতে পারে তাদেরকেই আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামতের কঠিন দিনে হাশরের ময়দানে খুঁজে খুঁজে ডেকে ডেকে তাঁর বিশেষ ছায়ার নীচে আশ্রয় দান করবেন।

পঞ্চম শ্রেণী ঃ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَاةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ

"ঐ লোক যাকে অভিজাত বংশের কোনো সুন্দরী রমণী (কুকর্মের) জন্য ডাকে। জবাবে সে বলে, আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি।"

বিচারের সেই কঠিন দিন হাশরের ময়দানে আল্লাহ্ পাক তাঁর বিশেষ ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন যারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার শাস্তির ভয়েই দুনিয়ার জীবনের ভোগের বস্তু এবং যৌন ক্ষুধা মেটানোর অবৈধ সুযোগ পাবার পরেও তা থেকে দুরে সরে যায়। আসলে এটা অত্যন্ত কঠিন

কাজও বটে। আর এটা তো নবী রাসূলদের চরিত্র। যেমন ইউসুফ (আঃ) এর রূপে পাগল হয়ে সুন্দরী জুলেখা তাঁকে অবৈধ কাজে বাধ্য করার চেষ্টার পরেও ব্যর্থ হয়েছিলো। যারাই এই চরিত্রের অধিকারী হতে পারবে আল্লাহ্ পাক তাদের এই বিশেষ চরিত্রের জন্য বিচারের দিন বিশেষ ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন।

যারা এই বিশেষ চরিত্রের অধিকারী হয়, তারা যেমন আখেরাতে বিশেষ মর্যাদা লাভ এবং কঠিন আযাব থেকে নিস্কৃতি পায়, তেমনি দুনিয়াতেও সম্মান এবং বিপদ থেকে মুক্তি পায়। যেমন হাদীসে পাওয়া যায়, "এক বার বনী ঈসরাইলদের তিনজন লোক সফরে পথ চলার সময় ঝড়-বৃষ্টির সম্মুখীন হয়। এতে তারা তিনজনই পাহাড়ের এক গুহায় আশ্রয় নেয়। গুহায় প্রবেশের পর পরই একটা বড়পাথর গড়ে এসে গুহার মুখ বন্ধ করে দেয়। এতে তিনজন ব্যক্তি বিপদের মধ্যে পড়ে যায়। এখন কোনো উপায় না দেখে তারা নিজেরা পরামর্শ করে বলে যে, এই বিপদ থেকে উদ্ধার একমাত্র আল্লাহ্ পাকই করতে পারেন। তাই তারা নিজ নিজ জীবনের ভালো আ'মলের কথা স্মরণ করে তারই বদৌলতে আল্লাহ্র কাছে বিপদ থেকে মুক্তির জন্য সাহায্য কামনা করতে থাকে। এই ভাবে তিন জনের তিনটি ভালো আ'মলের কথা স্মরণ করলে পাথরটি তিন বারে তিন ভাগ সরে যায় এবং তারা গুহা থেকে উদ্ধার পায়। তার মধ্যে এক জনের ভালো আমল ছিলো ঃ **সে তার চাচাত বোনের সাথে কূকর্মে লিপ্ত হবার জন্য তার বুকের উপর চড়ে বসে। তখন তার বিদুষি বোন বলে, হে আল্লাহ্র বান্দা তুমি আল্লাহ্কে ভয় করো,** তখন সেই ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ্র ভয় এসে যায় এবং সে তাদের চার পা এক জায়গায় হয়ে যাবার পরেও একমাত্র আল্লাহ্র ভয়েই কূকর্ম থেকে দুরে সরে যায়"। আর এই একটি ভালো আ'মলের জন্যই সেই কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার পায়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আজকে কি আমাদের মধ্যে আল্লাহ্র সেই ভয় এবং সেই চরিত্র আছে ? একবার আমরা সবাই নিজে আত্ম সমালোচনা করে দেখি আমাদের মধ্যে সেই ধরনের ঈমান এবং আল্লাহ্র ভয় আছে কিনা ?

৬ষ্ঠ শ্রেণী : وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَاتُنْفِقُ يَمِيْنِهُ ،

"ঐ ব্যক্তি যে গোপনে দান-খয়রাত করে, এমনকি তার ডান হাতে কি দান করলো বাম হাত তা টের পায় না"। মানুষ দান করে কিন্তু দান করার ক্ষেত্রে রিয়াও পয়দা হতে পারে। কেননা, দান করার ফলে শয়তান তার মনের মধ্যে নিজেকে দাতা দাতা ভাবার সুযোগ করে দেয়। আর মানুষের প্রবণতাও হলো এটা যে, কোনো ভালো কাজ করার পর তা প্রকাশ করার মানুসিকতা। সুতরাং দান করতে হবে এমন সংগোপনে যে, একমাত্র আল্লাহ্ এবং গ্রহিতা ছাড়া আর কেউ টের না পায়। যারা দুনিয়ায় আমিত্যএবং প্রদর্শনিচ্ছা ত্যাগ করে খালেশভাবে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই দান-খয়রাত করে, আল্লাহ্ পাক খুশি হয়ে বিচারের সেই কঠিন দিনে তাঁর বিশেষ ছায়ায় তাদেরকে আশ্রয় দান করবেন।

এ কথার ফলে একথা ভাবা যাবে না যে, প্রকাশ্যে বুঝি দান করা যাবে না। দান দু'ভাবেই করা যায়, গোপনে এবং প্রকাশ্যে। প্রকাশ্যে দান হলো সামাজিক ভাবে দান করা। আর প্রকাশ্য দান এই মানসিকতা নিয়ে করা যাবে যে, তার দানের কারণে অন্যরাও যেন উৎসাহ্ লাভ করে বেশী বেশী দান করে। এ ধরণের দানের ঘটনা রাসূলের জীবনে অনেক পাওয়া যায়। তিনি সামাজিক ভাবে যুদ্ধের জন্য সাহায্য চেয়েছেন এবং উপস্থিত জনতাকে দান করার জন্য উৎসাহ্ প্রদান করেছেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে প্রকাশ্য দান করতে যেয়ে যেন দুনিয়ার কোনো খেয়াল সৃষ্টি না হয়। আর যদি এ ধরণের কোনো খেয়াল হয়, তবে আখেরাতে আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদের দিয়ে তাদেরকে টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করাবেন।

সপ্তম শ্রেণী : وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَهُ

'ঐ ব্যক্তি যে একাকী গোপনে আল্লাহ্কে স্মরণ করে করে দু'চোখের পানি ঝরায়'। হাদীসে সর্বশেষ শ্রেণীভুক্ত লোক হলো যারা মানুষের সামনে নিজের অভাব এবং বিপদের কথা বলে না। বললে, একমাত্র মহান আল্লাহ্র

কাছেই বলে। যারা গোপনে আল্লাহ্‌র স্মরণে অর্থাৎ এবাদতে মশগুল থেকে আল্লাহ্‌র ভয়ে এবং ভক্তিতে কেঁদে কেঁদে দু'চোখের পানি ফেলে আর দুনিয়ার বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি এবং আখেরাতের কঠিন আযাব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করে। যারা এই কাজটি করে আল্লাহ্ পাক তাদের উপর অত্যন্ত খুশি হয়ে কিয়ামতের সেই কঠিন দিনে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে তাঁর বিশেষ ছায়ার নিচে তাদেরকে আশ্রয় দান করবেন।

গোপনে কেঁদে কেঁদে চোখের পানি ফেলার সব চেয়ে উত্তম সময় হলো শেষ রাতের সময়। অর্থাৎ দুপুর রাতের পর থেকে সুবহে সাদেকের পূর্ব সময়। এই সময়টা হলো মানুষের ঘুমের জন্য উত্তম সময়। যারাই এই উত্তম এবং আরামের ঘুমকে হারাম করে যায়নামাজে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে এবং দু'চোখের পানি ফেলে আল্লাহ্‌র কাছে যা চায় আল্লাহ্ তাকে তাই দেন বলে সহীহ্ বোখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ - يَقُوْلُ مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَاسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَّسْاَلُنِىْ فَاُعْطِيَهُ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَلَهُ -

যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকে, তখন স্বয়ং আমাদের রব আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া-তায়ালা দুনিয়ার কাছের আসমানে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন,ওগো কে আছো যে আমার কাছে কিছু চাবে,আমি তাকে তাই দিয়ে দেবো। ওগো কে আছো যে (এ সময়) আমার কাছে গোনাহ্ থেকে ক্ষমা চাবে। আর আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।

সুতরাং যে সমস্ত মুমিন বান্দা-বান্দিরা মানুষের অগোচরে গোপনে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ভয়েই কেঁদে কেঁদে চোখের পানি ফেলে, তাদেরকেই

আল্লাহ্পাক কেয়ামতের সেই ভয়াবহ কঠিন দিনে বিশেষ মর্যাদা দান করে তাঁর বিশেষ ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! তাই আমাদের কিছু চাইতে হলে আল্লাহ্র কাছেই চাইতে হবে। আর কাঁদতে হলে আল্লাহ্র সামনেই কাঁদতে হবে। তাঁর কারণ তিনিই হলেন সব কিছুর মালিক এবং তিনিই সব কিছুর অভাব মোচনকারী।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আলোচ্য হাদীসটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর আমাদের জন্য যে সব শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে তা হলো ঃ

● আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় ঈমান এবং অগাধ আস্থা রাখতে হবে।

● দুনিয়াতে যা কিছু করতে হবে তা কেবলমাত্র আল্লাহ্র ভয় এবং ভক্তিতেই করতে হবে।

● যার যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে, সেই ক্ষমতা অনুযায়ী অধিনস্থদের মধ্যে সঠিক বিচার ফায়সালা করতে হবে। কোনো ভাবেই যেন কারো হক বা অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়। যে পুরস্কার পাবার অধিকারী তাকে পুরস্কার দিতে হবে আর যে শাস্তি পাবার অধিকারী তাকে শাস্তিই দিতে হবে। এখানে কারো প্রতি দুর্বলতা বা কঠোরতা অবলম্বন করা যাবে না।

● যৌবন কালকে আল্লাহ্র এবাদত বন্দেগীর মধ্যে অতিবাহিত করতে হবে। এই জন্য আল্লাহ্র দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে জড়িত থেকে নিজের যৌবন কালকে দ্বীনের পথে কাটাতে হবে।

● নামাযের বয়স হলেই নামাযি হতে হবে এবং মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করতে হবে। দুনিয়ার দায়-দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নামাযের কথা ভুলে যাওয়া যাবে না। বরং এক নামায শেষ করার পর পরবর্তী নামায মসজিদে আদায় করার জন্য মনকে মসজিদের সাথে সব সময় টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে।

● দুনিয়ায় কারো সাথে বন্ধুত্তালী হবে একমাত্র আল্লাহ্র দ্বীনের জন্য। যদি নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু দ্বীন থেকে সরে যায় তবে তার সাথে দ্বীনের স্বার্থে বন্ধুত্তালী রক্ষা করা যাবে না। বরং তার থেকে পৃথক হয়ে যেতে হবে। আর অপরপক্ষে যদি কোনো অপরিচিত ইমানদার ব্যক্তি দ্বীনের

পথে শামিল হয়ে যায় তবে তাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ বন্ধুত্তালী থাকা না থাকা, দু'জনে একত্রিত হওয়া না হওয়া একমাত্র দ্বীনের খাতিরে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই হবে।

● জ্বেনার অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য পর্দা মেনে চলতে হবে। যদি কোনো মেয়ে অবৈধ প্রেম নিবেদনে আহবান জানায় তবে তা থেকে দুরে সরে যেতে হবে। কেননা, প্রেম নিবেদনের মধ্য দিয়েই জ্বেনার মত মহা পাপে জড়িয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আর শাস্তিযোগ্য জ্বেনা না হলেও চোখের এবং মনের জ্বেনা তো হবে।

● সামাজিক দান ছাড়াও গোপনে বেশী বেশী দান করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। যদি গোপন দান প্রকাশ করার জন্য মনের মধ্যে কোনো কল্পনা হয় অথবা গল্পের ছলেও বেরিয়ে যায় তবে সাথে সাথে তা বলা বন্ধ করে দিতে হবে এবং "আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তনীর রাযীম" পড়তে হবে।

● গোপনে একাকী আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁদে কেঁদে চোখের পানি ফেলতে হবে। যদি চোখের পানি নাও আসে তবুও হাদীসে এসেছে কাঁদার ভাব করতে হবে। আর গোপনে কাঁদার মুক্ষম সময় হলো রাতের শেষ সময়। এই সময় উঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সুখ-দুঃখের কথা মানুষের কাছে না বলে বরং গোপনে আল্লাহ্‌র কাছেই বলতে হবে।

আহবান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে হাদীসের যে দারস পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল হয়ে যায় তার জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই হাদীস থেকে যে সাতটি আমলের কথা আমরা জানতে পারলাম তা যেন বাস্তব জীবনে কার্যকরী করে কেয়ামতের সেই ভয়াবহ দিনে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করে তাঁর বিশেষ ছায়ার নীচে আশ্রয় লাভ করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি। (মাআস্‌সালাম)

ঃ সমাপ্ত ঃ

রাসূলুল্লাহ্ সাঃ বলেন,' যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে ঠিক করে নেয়' । -বুখারী

লেখকের অন্যান্য বই

- দারসে কুরআন - ১ম খন্ড
- দারসে কুরআন - ২য় খন্ড
- দারসে কুরআন - ৩য় খন্ড
- দারসে হাদীস - ১ম খন্ড
- দারসে হাদীস - ২য় খন্ড
- দারসে হাদীস - ৩য় খন্ড
- ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ
- পাঁচ দফার আলোকে কুরআন-হাদীস
- নির্বাচিত বিষয়ভিত্তিক হাদীস
- বিষয় ভিত্তিক কুরআন-হাদীস সংকলন (১-৩ একত্রে)
- বাংলা উচ্চারণসহ ১০০ মাসনুন দোয়া
- আল-কুরআনে মানব সৃষ্টি তত্ত্ব



সাহাল প্রকাশনী

ডিজাইন : অঙ্কুর, খুলনা, ০১৭২৭৫৪৮